রূপকথার দেশে

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
২২—১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬।

প্রকাশক
দ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক
ইণ্ডিয়ান প্রেস
(পাবলিকেশন)
প্রাইভেট লিমিটেড
এলাহাবাদ

প্রচ্ছদ-শিল্পী
পূর্ণজ্যোতিঃ ভট্টাচার্য

চিত্র-শিল্পী :
বীতপাল
ও
পূর্ণজ্যোতিঃ ভট্টাচার্য

প্রথম সংস্করণ :
ফাল্গুন ১৩৬৫
মার্চ ১৯৫৯

মুদ্রাকর
জিতেন্দ্রনাথ বসু
ইণ্ডিয়ান প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড্
কলিকাতা-১৩

জগৎ যোড়া মায়েরা সব নিত্য বলে শুনি,
মোদের ঘরের খোকা খুকি যত যাদুমণি!
সন্ধ্যেবেলা গল্প বলো!
সবাই বলে যখন,
কোন্ সাগরের অতল হতে তুলে আনবো ধন?
পিংকু এলো মায়ের কাছে,
মুখভরা হেসে,
এই নাও মা! হাতে দিলাম 'রূপকথার দেশ'।
গল্পবলো শেষে!

রূপকথা থাকে নানা বিভিন্ন শ্রেণীর। লোকে রূপকথা ভালবাসে। নানা কারণে ভালবাসে—প্রথম কথা—নানা দিকে নানা ভাবে নানা দেশে চলিয়া আসিতেছে ইহার গতি। সেকালের ও একালের যাঁহারাই রূপকথা নিয়া আলোচনা করেন তাঁহাদের সকলের মুখেই শোনা যায়—এক কথা, রূপকথা এমন একটি বিষয় যাহা পড়িতে সকলেই ভালবাসে। প্রাণে দেয় 'আনন্দ' এবং মনে কল্পনার রঙিন স্বপ্ন রচনা করে। যেমন শিশু ও বালক-বালিকাদের কাছে রূপকথা খুব প্রিয়, তেমনি বড়দের কাছে ও প্রিয়। একজন পন্ডিত রূপকথার কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—রূপকথা সবর্বজন প্রিয়। সে কোন যায়গা গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। 'The folktale knew no frontiers'.

রূপকথা দুনিয়ার সবদেশে আছে। মানুষের জীবনের সঙ্গে রূপকথার বৈচিত্র পূর্ণ স্রোতধারা চিরকাল প্রবাহিত। দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে একটা অখন্ড যোগসূত্র বাঁধিয়া দিয়াছে। দেব-দৈত্য-দানব, রাক্ষস-রাক্ষসী, রাজপুত্র রাজকন্যার কাহিনী, অজানা দেশের অলৌকিক কাহিনী যেমন আছে, তেমনি কতনা শিল্পী, কতনা ভাস্কর স্থপতির জীবনীই না পাই রূপকথার মাধ্যমে। কেনা ভালবাসেন লোকসঙ্গীত, লোকগাথা, লোকনৃত্য, খেলাধূলা, কতনা গল্প। রূপকথার মধ্যদিয়া আবার পাই উদার বিশ্বজনীন মিলনের মন্ত্র। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে রূপকথার আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতির বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিদ্যালয়ে। এ সবদেশের সব জাতির বিভিন্নমুখী মনোভাবের এ কটা যোগসূত্র দেখিতে পাই রূপকথার রূপসাগরে।

আমি রূপকথার দেশে বইখানিতে নানা বিভিন্ন বিষয়ের রূপ কথার প্রকাশ করিয়াছি। নানা দেশের নানা বিষয়ের গল্পের অবতারণা করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি গল্প বালক-বালিকা ও কিশোর বয়স্ক বালকদের ভাললাগিবে। বালক-বালিকাদের অভিনয়োপযোগী একটি রূপকথার নাট্যরূপ ও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। আমার মনে হয় যাহাদের জন্য এই রূপকথার দেশ লেখা হইয়াছে, এই সব গল্প পড়িয়া তাহারা রূপকথার দেশের স্বপ্ন রাজ্যে প্রবেশ করিয়া আনন্দ লাভ করিবে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

কলিকাতা
ফাল্গুন, বাসন্তী পঞ্চমী ১৩৬৫

সূচী

ভিখারী রাজা

এক যে ছিলেন রাজা তাঁর দেশ ছিল—এক পাহাড়ে। চারিদিক ছিল পাহাড়-পর্ব্বতে ঘেরা। সুন্দর পথ-ঘাট, বনে-বনে শ্যামল সুন্দর শোভা। কত ফুল ফোটে গাছে গাছে। কত পাখী গান গায়। সবুজ নীল কত বর্ণের-কতনা ছন্দের সেই বনে-বাগানে-পুষ্পকুঞ্জে।

রাজার নাম ছিল সুজন সিং। মানুষটি ছিলেন সত্যিই সুজন। প্রতিদিন সকালে ও বিকেলবেলা, রাজা ছেলের সঙ্গে বেড়াইতেন-খেলা করিতেন, আনন্দে-গানে ও খেলা-ধুলায় কাটিত তাঁদের দিন। মস্ত বড় রাজধানী। রাজধানীতে কত লোক-জন, কত হাসি-গান, আনন্দ-বাজনা ত লাগিয়াই আছে। রাজ্যের ছোট-বড় সকলের কাছেই ছেলেটি বড় প্রিয়। রাজা-রাণীর ত নয়নের মণি। প্রতি দিন খেলা করেন, বেড়ান ছেলের সঙ্গে—রাজা কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয়ের গল্প করেন। —এমনি চলে দিন...

একদিন বেড়াতে বাহির হইয়াছেন, রাজা ও ছেলে রোজ যেমন যান;—আরম্ভ হইল ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি—ধুলো-বালি উঁড়িতেছে। ওদিকে বড় বড় ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়া সুরু হইল, ঝড়ের ঝাপ্‌টা হাওয়ায় সব উড়াইয়া লইয়া গেল—ভাঙ্গিয়া দিল বড় বড় গাছপালা।

অন্ধকার—অন্ধকার—! সেই ভীষণ আঁধারে কিছু দেখা যায় না, এমনি সেদিনকার আঁধার সন্ধ্যায় রাজা ও রাজপুত্র দু' জনে পড়িলেন দুদিকে ছিটকাইয়া—

—পরে যখন ঝড়-ঝাপটা থামিয়া গেল, আকাশে ফুটিয়া উঠিল চাঁদতারা—রাজপুত্রের সন্ধানে লোকজন ছুটিল। দিনের পর দিন চলিল সন্ধান, কিন্তু সন্ধান মিলিল না—রাজ্য যুড়িয়া উঠিল হাহাকার।

একদিন রাজা পাগলের মত একা চলিয়াছেন এক নিশীথ রাতে,

পুত্রের সন্ধানে। রাজা উন্মাদের মত আর রাণী পাগলিনী। কিন্তু কেউ দেয়না তাঁহাদের ছেলের কোন সন্ধান।

রাজা চলিয়াছেন-ত-চলিয়াছেন—এক রাতে রাজা এলেন এক গ্রামের শেষ প্রান্তে এক সোনালী দেশের নদীর পাড়ে। নদীর পাড়ে এক প্রকান্ড রাজপুরী। যেন সোনামাখা রূপার মতিমালা দুলিতেছে-নাচিতেছে পাহাড়ের গায়ে। প্রকান্ড চওড়া শ্বেত পাথরের উচু সোপান শ্রেণী। তারি পাশে পাশে ফুলের বাগান। রাজার হাঁটিতে হাঁটিতে আসিয়াছে ক্লান্তি। সেখানে এসে রাজা যখন দাঁড়াইয়াছেন—ঠিক্ সেই সময়—আসিলেন এক ফুলের রাণী।

রাজাকে দেখিয়া বলিলেন, শুন্‌ছো রাজা সুজনসিং!—

আমি ফুলের রাণীর সই ফুলকুমারী......

কে তুমি গো ফুলের রাণী!

শুধাইলেন রাজা।

ফুলের রাণী বলিলেন—আমি ফুলের রাণী নই, ফুলের রাণীর সই, ফুলকুমারী। আমাদের ফুলের রাণী, আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার কাছে।

—কেনগো কেন? জিগ্যেস করলেন, কৌতূহলে রাজা সুজনসিং।

তোমার-ত ছেলে হারিয়েছে,—তাই তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার কাছে, তোমাকে জানাতে কি করে তোমার হারাণো ছেলেকে খুঁজে পাবে। যদি তোমার ছেলে রতনকে পেতে চাও তা' হ'লে তোমাকে ভিখারী সাজতে হবে, তুমি যে রাজা এ-পরিচয় কাকেও দিতে পারবে না। তোমার রাজত্বের শেষ সীমানায় এক মায়াকানন আছে—যদি সেখানে যেতে পার, তা হ'লে তোমার ছেলেকে পাবে। খুব সাহসী লোক না হলে সেখানে কেউ যেতে পারে না।

মেয়েটি এ-কথা বলিয়াই কোথায় যে উধাও হইয়া চলিয়া গেল, রাজা তাহার কোন সন্ধানই করিতে পারিলেন না।

সুজনসিং মনে মনে এই মেয়েটির কথা ভাবিতে লাগিলেন। কি করিবেন? সত্যই কি তিনি ভিখারীর বেশে সেই বনের দিকে যাইবেন? আর না যাইয়াই বা কি করিবেন? বাড়ীতে আসিয়া শুধু ছেলের জন্য কাঁদিলেইত আর ছেলেকে পাওয়া যাইবে না।

তারপর দিন সত্য সত্যই রাজা এক ভিখারী সাজিয়া বাহির হইলেন পথে। তখন তাঁহাকে রাজা বলিয়া আর কে চিনিবে? কত লোকজন আসিতেছে-যাইতেছে—কেহ তাহার দিকে চাহিতেছে না। গোরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী ধুলো উড়াইয়া রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছে, কেহ তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহেনা। কেহই তাকে চিনিতে পারেনা।

রাজা কিছুদূর যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন একটা চা'র ঘোড়ার গাড়ী সাম্নের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। গাড়ীখানা রাজার পরিচিত, এ-নগরের একজন বড় সদাগরের; সদাগর রাজার কাছে অনেক দিন তার দান-ধ্যান সম্বন্ধে গল্প করিয়াছে। রাজা ভাবিলেন বেশ ত একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক্ না। তা হ'লেই বুঝতে পারব লোকটার কথা সত্য কি মিথ্যা! যখন গাড়ীখানা প্রায় রাজার

নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে তখন তিনি ঠিক্ রাস্তার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গাড়োয়ান কি করে? বাধ্য হইয়াই গাড়ী থামাইল। যেমন গাড়ী থামিয়াছে, অমনি গাড়ীর জানালার ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া সদাগর খুব চীৎকার করিয়া বলিল— রাস্তার ভিতর কে আমার গাড়ী দাঁড় করালে? রাজা অমনি গাড়ীর পাশে আসিয়া হাতযোড় করিয়া বলিলেন: সদাগর মশাই, শুনেছি আপনি খুব দয়ালু, আমি গরীব ভিখারী, সারাদিন কিছু খাইনি, আমাকে দু'টো পয়সা দিন্ না? বড় ক্ষিদে পেয়েছে। কিছু কিনে খাই। একথা শুনিয়াই সদাগর খুব রাগ করিয়া পাহারাওয়ালাকে বলিলেন—এ-ভিখারী বেটাকে বেশ দু'এক ঘা দিয়ে তাড়িয়ে দাও। কি সাহস! রাস্তার ভিতর কিনা আমার গাড়ী থামায়!

সদাগরের হুকুম পাওয়া মাত্র পাহারাওয়ালা রাজাকে গলা ধাক্কা দিতে দিতে রাস্তার এক পাশে লইয়া গেল এবং সপাং সপাং করিয়া খুব কয়েক ঘা বেত মারিয়া প্রস্থান করিল। সদাগর ইহাতেও খুশী না হইয়া চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন—ওরে, খুব করে মার্। এমন করে পিটুনি দিবি, যেন বেটা আর দাঁড়াতে না পারে।

রাজা বেতের আঘাতে একেবারে অচৈতন্য হইয়া পথের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। নিষ্ঠুর সদাগর হাসিতে হাসিতে গাড়ী দৌড়াইয়া চলিয়া গেল।

কিছুকাল পরে রাজার জ্ঞান হইল। ঠান্ডা বাতাস লাগিয়া শরীরের বেদনাটাও অনেক কমিয়া গেলে আবার হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, কি নিষ্ঠুর এ— পৃথিবী, মানুষ এমন পিশাচ হয়! এমন দয়া-মায়া-বিহীন নির্ম্মম নিষ্ঠুর হয়? এমন যে পাপী, এমন যে নিষ্ঠুর, আমি তাকে দয়ালু মনে করেছিলাম। মানুষ চেনা ভার! আবার চলিতে লাগিলেন। দেখিলেন সম্মুখের দিক হইতে আর একখানা গাড়ী ছুটিয়া আসিতেছে। এ-গাড়ীখানাও তাঁর পরিচিত। এ-খানা রাজার কোতোয়ালের। কোতোয়াল ও লোকের কাছে নিজকে খুব দয়ালু বলিয়া প্রকাশ করে। রাজা ভাবলেন এ লোকটা বোধ হয় সদাগরের মত হইবেনা। তিনি এবারও আগেকার মত কোতোয়ালের গাড়ী থামাইলেন। সদাগরের মত কোতোয়ালও

রাগিয়া অস্থির। রাজা এবারও নিজের দৈন্য-দশা জানাইয়া ভিক্ষা চাহিলেন। বরাত গুণে কোতোয়ালের চাকরদের হাত হইতে রাজার পিঠে এবারও বেশ উত্তম-মধ্যম জুটিল। কিন্তু এবার আর রাজা তাহা সহ্য করিলেন না। সেকালে সুজন সিংয়ের মত পালোয়ান কেহ ছিল না। যেমনি চাকরেরা তাঁহাকে এক ঘা বেত মারিয়াছে, অমনি রাজা তাহাদের ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়া গাড়ীর উপর লাফাইয়া উঠিলেন এবং কোতোয়ালকে রাস্তার উপর ধুলার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া নিজে দৌড়াইয়া পলাইলেন। কোতোয়াল তাড়াতাড়ি রাস্তার ধুলা ঝাড়িয়া দাঁড়াইয়া: ওরে ভিখিরী বেটাকে ধরে আন্, ওরে ভিখিরী বেটাকে ধরে আন্ বলিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন। রাজা ততক্ষণে সকলের অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন।

ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক ঢাকা পড়িল। রাজা কি করেন? কোথায় যান? ক্ষুধার জ্বালায় ও প্রহারের বেদনায় প্রাণ অস্থির! পা আর চলে না, কিন্তু না এগুলেও নয়। তাই ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন এবং ভাগ্য-গুণে একটু অগ্রসর হইয়াই দেখিতে পাইলেন সম্মুখে ধু—ধু করে একটা তেপান্তরের মাঠ। মাঠের ওপারে খুব বড় একটা বন। হয়ত বনের ধারে ধারে কোন একটা কুঁড়ে ঘর আছে। প্রকৃতপক্ষেও তাহাই, রাস্তার ধারের ছোট একটী বন পার হওয়া মাত্রই অল্প দূরে একটা ছোট কুঁড়ে ঘর দেখিতে পাইলেন। রাজা দ্রুত পদে সেখানে গিয়া পেঁীছিলেন এবং ঘরের দরজা ধাক্কা দেওয়া মাত্রই খুলিয়া গেল।

দরজা খুলিলে দেখিলেন ঘরের ভিতরে চারজন লোক মুখোমুখি হইয়া বসিয়া গল্প করিতেছে। তাহাদের মধ্যে যে লোকটি দলের কর্ত্তা সে রাজাকে দেখিয়া বলিল: কি হে ভাই? নিকটে এসে বস, তুমি নিশ্চয় কোন বিপদে পড়ে এখানে এসেছ, কেমন নয়? রাজা বলিলেন: তোমার অনুমান ঠিক। ভাই আমিও একজন তোমাদের মতন ভিখারী। আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বড়ই কাতর হয়েছি। রাজার কথা শেষ হইবা মাত্র তাহাদের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল-তা ভাই, যা'ক্ সে কথা। এস আমাদের যা আছে, তাই সবাই মিলে খাই। যদিও খুব প্রচুর নয়, তবু এক জন নিঃসহায় সমান অবস্থার বন্ধুকে এ-তুচ্ছ খাবার জিনিষের অংশ দিতে কোন লজ্জা নেই। একথার পর তাহারা সকলে রাজাকে লইয়া খাইতে

বসিল। রাজা খাইতে খাইতে বলিলেন: ভাই, তোমাদের ব্যবহার দেখে বড়ই তৃপ্তিলাভ করলাম। আমি ভেবেছিলাম সংসারটা বুঝি বড় নিষ্ঠুর, এখানে বুঝি দয়া মায়া নেই। কিন্তু তা নয়, তোমাদের মত মহৎ ব্যক্তিও যে এরকম নিবিড় বনের ভিতরে বাস করে, তাত আমি জানতুম না। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, যদি ভগবান কোনদিন দিন দেন, তা হ'লে নিশ্চয়ই তোমাদের এ-উপকারের ঋণ পরিশোধ করবো, এ-উপকারের যথেষ্ট পুরস্কার দেব। সে-দলের একজন বলিল—সে কি করে হ'বে ভাই? তুমিও ত আমাদেরি মত একজন পথের ভিখারী। আমাদের উপকার করতে পারে

......ঘরের মধ্যে চারজন লোক গল্প করিতেছে

একজন, সে এ-রাজ্যের রাজা সুজন সিং। রাজা বলিলেন সে রাজা কি করে তোমাদের সাহায্য করবে?

তবে শোন ভাই, এই যে মাঠের ধারে বনটা দেখছ, এবনের ভিতর হরিণ, ভালুক, বাঘ অনেক রকম জানোয়ার বাস করে। আমাদের ইচ্ছা হয় মনের সাধে এবনে শিকার করি। কিন্তু রাজার হুকুম নেই, কি করে সাধ মিটাই? — আচ্ছা তোমাদের সে সাধ মিট্‌বে। রাজা অতর্কিত ভাবে একথাটা বলিয়া ফেলিলেন। তাহার মুখ হইতে একথা বাহির হইবা মাত্রই তারা চার জনে একসঙ্গে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল: তোমাকেও ত দেখ্‌ছি আমাদেরি মত একজন গরীব ভিখারী, তুমি কি করে বল্লে যে আমাদের এবনে শিকার করবার সাধ মিট্‌বে? তাহাদের দলপতি মনে মনে ভাবিলেন কাজটা ভাল হইল না, হয়ত এ-বিদেশী অতিথি কি মনে করবে। এরূপ ভাবিয়া সে প্রকাশ্যে বলিল: ভাই, আমরা বড্ড অন্যায় করেছি, তুমি আমাদের অপরাধ মাপ করো। কি জান ভাই, সারাদিন ভিক্ষা করে সন্ধ্যের সময় এ-কুটিরে ফিরে এসে মনের ভিতর এমনি একটা আনন্দ জেগে ওঠে যে কিছুতেই নিজেদের সাম্‌লে উঠতে পারিনে। তাই খেয়ালের বশে দু'চারটা কথা বলে ফেলেছি।

তারপর দলপতি ঘরের এক কোণ হইতে চারিটি মোমবাতি সংগ্রহ করিয়া জ্বালাইয়া দিল, উজ্জ্বল আলোকে ঘরখানা যেন আনন্দে হাসিতে লাগিল। তখন বেশ বিনয় করিয়া দলপতি রাজাকে বলিল: ভাই, আজ তুমি আমাদের এখানে এসেছ, আমাদের ইচ্ছে, তোমাকে আমাদের নিজ নিজ গুণপনা দেখিয়ে তুষ্ট করি। আর আমাদের একটা রীতি আছে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই চারিটা মোমবাতি জ্বলবে, ততক্ষণ আমরা একজনে গাইব, একজনে নাচ্‌ব, একজনে বেহালা বাজাব, আর এক জনে গল্প করব। তুমি ভাই আমাদের এ বেয়াদবি মাপ করো।

সুজন সিং বলিলেন: সে কি কথা, তোমরা আমার জন্য এতটা করলে, তারপর আবার সারাদিন যে দুঃখকষ্ট পেয়েছি সে-সব নানা আমোদ-আহ্লাদের ভিতর দিয়ে দূর করে দিতে চাও, এতে আমি অসন্তুষ্ট হ'ব কেন ভাই? তোমরা তোমাদের গান-বাজনা আরম্ভ

কর। রাজার কথা শুনিয়া তাহারা খুব খুশি হইল এবং একে একে নিজ নিজ গুণপণা দেখাইতে আরম্ভ করিল। প্রথমে দলপতি, যার নাম রামশরণ, সে একটী বেহালা নিয়া এমনি মধুর-সুরে বাজাইতে আরম্ভ করিল যে রাজার মনে হইল বেহালার তারের ঝঙ্কার যেন সমস্ত বিশ্বজগৎ স্তব্ধ শান্ত হইয়া শুনিতেছে।

রাজা সারাদিনের দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া গেলেন। রামশরণের বেহালা বাজানো শেষ হইলে দলের আর একজন উঠিয়া দাঁড়াইল, ইহার নাম কাশীনাথ। কাশীনাথ নাচিতে আরম্ভ করিল। তাহার নাচ শেষ হইলে কিষনলাল নামে তৃতীয় বন্ধু গল্প বলিতে সুরু করিল। সে যে কি মজার গল্প, কত রাজা রাজপুত্রের কথা, কত নাগ-নাগিনী-পরী-দস্যু-ডাকাত-রাক্ষস-খোক্কসের কথা, সে কি বলিয়া বুঝানো যায়! চারিজনে অবাক্ হইয়া তাহার গল্প শুনিল। সকলের শেষে গান গাহিতে আরম্ভ করিল কিশোরীলাল। তাহার গানে আনন্দ, প্রীতি ও উৎসাহ একত্র মিলিত হইয়া ঘরের চারিদিকে নাচিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল। এ-সকল শেষ হইলে তাহারা ক্লান্ত দেহে যার যার শোয়ার জন্য নিজ নিজ বিছানায় গেল। রাজাকেও তাহারা শুইবার জন্য ভিন্ন একটী বিছানা করিয়া দিয়াছিল। সুজন সিং তাদের এ উপকারের জন্য ধন্যবাদ জানাইয়া নিজের ভিন্ন বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। ভোরের রবির সোণালি আলো যখন জানালার ভিতর দিয়া আসিয়া তাঁহার গায়ে পড়িল, রাজা তখন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন। তারপর সেই ভিখারী বন্ধুদের বলিলেন: ভাই, আমাকে মায়া-কাননের পথটা দেখিয়ে দিতে পার?

রাজার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই চারিজন ভিখারী একত্র বলিয়া উঠিল: কি সর্ব্বনাশ! তুমি সে বনের কথা বল্ছ কেন? সেখানে কি কেউ যেতে পারে? ও বড় ভয়ানক যায়গা। সেখানে গিয়ে কেউ ফিরে এসেছে এমনত শোনা যায় না। যে যায় সে আর ফিরে না। ভাই, তুমি সেখানে যেওনা। আমরা তোমাকে মানা কর্ছি। রাজা বলিলেন, ঐ বনের ভিতর আমার ছেলে বন্দী হ'য়ে আছে, আমি তাকে যে রকম করে হয় উদ্ধার কর্বো। বন্ধুগণ! তোমরা আমায় বাধা দিওনা। রাজার কথা শুনিয়া তাহারা সকলেই

কিছুকালের জন্য চুপ করিয়া রহিল ও একটু চিন্তা করিয়া দলপতি রামশরণ কহিল: দেখ্‌ছি তুমি নিশ্চতই সেখানে যাবে, তোমায় আর বাধা দিচ্ছিনে। তবে তোমায় এ-বাঁশীটি দিলেম সঙ্গে নাও। যদি তুমি সেখানে গিয়ে কোন বিপদে পড় তবে ঐটি একবার বাজালে আমি যা'ব, দু'বার বাজালে কাশীনাথ যাবে, তিনবার বাজালে কিষণলাল, আর চার বার বাজালে কিশোরিলাল যাবে।

রাজা বাঁশীটি সঙ্গে করিয়া নিলেন, আর তাদের এ-দয়া ও উপকারের জন্য বিশেষ করিয়া ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলেন। তখন একটু বেলা হইয়াছে। ভোরের সুর্য্যের মিষ্টি আলো আর নাই। চারিদিকে রৌদ্র ঝাঁ—ঝাঁ করিতেছে। সুজন সিং সেই মায়া বন লক্ষ্য করিয়া হাঁটিতে লাগিলেন। মাঠের পর মাঠ, বনের পর বন পার হইতে লাগিলেন। কিন্তু একটী জন-প্রাণীর সঙ্গেও তাঁহার দেখা হইল না। যখন প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময় তিনি মায়া-বনের ধারে গিয়া পৌঁছিলেন। বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দেখিতে পাইলেন, প্রকান্ড একটা সিংহ-দরজা। বন্ধ দরজার ধারে একজন সাদা কাপড় পরা পাহারাওয়ালা চুপ্ করিয়া বসিয়া আছে। দরজার একপাশে একটা সোণার বেহালা ঝুলান। সেখানে একখানা কাঠের উপর খুব বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে; 'যে খুব ভাল বেহালা বাজাতে পারে সে এই দরজা খুলতে পারবে।'

রাজা কি করেন? বেহালাখানা হাতে লইয়া কতবার বাজাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে বেহালা হইতে দু'একটা টুংটাং শব্দ ছাড়া শব্দ হইলনা রাজা কোন মতেই বাজাইতে পারিলেন না। দরজা আগেরি মত বন্ধ রহিল। তখন চাঁদ উঠিয়াছে। জ্যোৎস্নালোকে মায়াকানন আরও নিবিড় বলিয়া বোধ হইতেছিল। রাজা নিরুপায়! বেহালা বাজাইতে না পারিলে ত আর দরজা খুলিবে না! কি করেন? ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাঁহার ভিখারী বন্ধুদের কথা মনে হইল। রাজা অমনি তারা যে বাঁশীটি দিয়াছিল তাহাতে একটিবার শব্দ করিলেন। আবার সব চুপ্‌চাপ্। কিছুকাল পরে তার বোধ হইল কে যেন চট্ পটাপট্ পায়ের শব্দ করিয়া তাঁহার দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। যে আসিল, সে তাহার ভিখারী বন্ধু-দলপতি রামশরণ। রামশরণ রাজাকে জিজ্ঞাসা

করিল: ভাই, তুমি আমায় কেন ডেকেছ? রাজা তাঁহার হাতে বেহালাটি দিয়া কাঠের উপরে যে লেখা রহিয়াছে তাহার মর্ম্ম বুঝাইয়া বাজাইতে বলিলেন। রামশরণ বেহালাটি হাতে করিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। কি সে সুর! কি সে রাগিণী! তার এ-বেহালার তান আকাশে-বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই পাহারাওয়ালাটিও অবাক্ হইয়া সিংহ-দ্বার খুলিয়া দিল। রাজা বন্ধু রামশরণকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় দিলেন এবং নিজে ঐ দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। যেমন তিনি প্রবেশ করিলেন, অমনি আগের মত সে দরজা বন্ধ হইয়া গেল। রাজা হাঁটিতে হাঁটিতে খানিক দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন সাম্‌নে আর একটী দরজা। সে-দরজার একধারে একটা মস্ত বড় কালো সিংহ পাহারা দিতেছে। এখানেও দরজার একধারে একটা কালো কাঠের উপর লেখা রহিয়াছে—'যে খুব ভাল নাচ্‌তে জানে, সে এই দরজা খুলতে পারবে।'

রাজা নাচিতে চেষ্টা করিলেন দুম্ দুম্ দুপ্ দুপ্ শব্দ করিয়া পা ফেলিতে লাগিলেন, কিন্তু সেকি নাচা? তিনি-ত আর কোনদিন নাচেন নাই কাজেই তাঁহার নাচে কোন ফল হইল না—দরজা খুলিল না। রাজার তখন বাঁশীটির কথা মনে পড়িল। তিনি অমনি আগের মত দুইবার বাঁশী বাজাইলেন। তারপর ক্ষণকাল মধ্যেই কাশীনাথ সেথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আসিয়াই বলিল: ভাই তুমি আমায় কেন ডেকেছ? রাজা বলিলেন: 'ভাই কাশীনাথ, সেদিন যেমন নেচেছিলে এখানেও একবার তোমার সেইরূপ নাচ্‌তে হবে, নইলে যে দরজা খুলবে না। কাশীনাথ রাজার কথায় নাচিতে আরম্ভ করিল। নাচ শেষ হইতেই সেই যে কালো সিংহটা নাচে মুগ্ধ হইয়া তাহার থাবা দিয়া দরজাটা খুলিয়া দিল। রাজা ধন্যবাদ দিয়া বন্ধুকে বিদায় দিলেন এবং সেই দরজা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং আবার মায়া-কাননের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হাঁটিতে হাঁটিতে কিছুদূর যাইবার পর পথের একপাশে একটা বিরাট লৌহ দরজা দেখিতে পাইলেন, আর সেই দরজার কাছে একটি অতি কুৎসিত বুড়ী বসিয়া রহিয়াছে। বুড়ীর পা জড়াইয়া মস্ত বড় একটা কালো সাপ। সাপটা ফণা তুলিয়া ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতেছে। তাহার চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছে। কি

ভয়নক! রাজা সেখানে পৌঁছানমাত্রই বুড়ীটা খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া বলিল: ভাল গল্প না শুনাতে পারলে তোমাকে আমরা কোন মতেই যেতে দোব না। রাজা গল্প বলিতে না পারিয়া আগের মত বন্ধু ভিখারীরা দেওয়া বাঁশীতে তিনবার শব্দ করিলেন। বাঁশীর ডাকে কিষাণলাল আসিয়া বলিল: ভাই, তুমি কেন আমায় ডেকেছ? রাজা বলিলেন: তুমি ভাই একটি গল্প বল, না হলে এ বুড়ী আমায় ভেতরে যেতে দেবে না। কিষণলাল এমন চমৎকার গল্প বলিল যে বুড়ী রাজাকে পথ ছাড়িয়া দিল আর সেই কাল সাপটিও ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি গাছের আড়ালে লুকাইয়া রহিল।

রাজা তখন ভিখারী বন্ধুকে ধন্যবাদ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, আবার কিছু দূর যাওয়ার পর রাজা দেখিলেন কুয়াসায় চারিদিক ঢাকিয়া গিয়াছে আর তাহার ভিতর হইতে কে যেন বলিতেছে—যদি ভাল একটী গান গাইতে পার, তা হ'লে এ কুয়াসা কেটে যাবে। রাজা আবার বাঁশীতে আওয়াজ করিলেন। এবার আসিল কিশোরীলাল। সে আসিয়া বলিল—কি ভাই? কি জন্য ডেকেছ? রাজা বলিলেন ভাই দেখ্‌ছ না তুমি গান না গাইলে এ-কুয়াসা কাট্‌বে না, তুমি একটা গান গাও! কিশোরীলাল গান আরম্ভ করিবা মাত্র সব কুয়াসা কাটিয়া গেল। কিশোরীলালকে বিদায় দিয়া রাজা আবার হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন।

রাজার পথ চলিতে চলিতে শরীর অবশ হইয়া পড়িল। পা আর চলে না। একটা বড় গাছের নীচে বসিয়া খানিক বিশ্রাম করিবেন বলিয়া যেমন বসিতে যাইতেছেন অমনি অল্প দূরে তারার আলোর মত একটা লাল আলো দেখিতে পাইলেন। রাজা মনে করিলেন আচ্ছা দেখা যাক্‌না এ-আলোটা কিসের, কোথা থেকে আস্‌ছে, আবার ধীরে ধীরে সেই আলো লক্ষ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন, আলোটা ক্রমেই বড় হইতে লাগিল। শেষটায় তিনি একেবারে আলোর কাছে গিয়া পৌঁছিলেন। দেখিলেন—একখানা ছোট ঘর হইতে আলো বাহির হইতেছে। সুজন সিং হামাগুড়ি দিয়া চুপি চুপি যেন কোন শব্দ না হয় এমন ভাবে আস্তে আস্তে জানালার দিকে গেলেন। জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলেন ঘরের ভিতর একটা বড লাল আলো জ্বলিতেছে। আর একপাশে নানা রকম ভাল খাবার

জিনিষ সাজান রহিয়াছে, সেখানে আর কেহ নাই। ধীরে ধীরে দরজার কাছে গিয়া যেমন দরজা খুলিতে যাইবেন অমনি দেখিতে পাইলেন দরজার উপর একখানা কাঠে খুব বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে:—'বনের ডাইনী ও সাত বাঘিনীর ঘর।' রাজার বড়ই ভয় হইল। কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় এম্নি অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন যে 'যা হ'বার হ'বে' এরূপ মনে করিয়া দরজা খুলিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিলেন। ভাবিলেন আঃ যখন ডাইনী ও বাঘক'টা আস্‌বে তখন নিশ্চয়ই টের পাব, আর অম্নি দৌড়িয়ে বনের ভিতর গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পার্‌ব। সহসা বাইরে একটা বিকট হাসি আর একত্রে কতকগুলি পায়ের শব্দ ও বাঘের ডাক শুনিতে পাইলেন। রাজা ভয়ে কাঁপিতে আরম্ভ করিলেন। কোথায় লুকাইবেন? ঘরের এদিক্‌ সেদিক্‌ লুকাইবার যায়গা খুঁজিতে লাগিলেন, খুঁজিতে খুঁজিতে ঘরের এক কোণে একটা খুব বড় কাঠের সিন্দুক পড়িয়া আছে দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি সে সিন্দুকের ডালা খুলিয়া তাহার মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন এবং ধীরে ধীরে উপরের ডালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া সিন্দুকটার এক কোণে যে একটা ছিদ্র ছিল সেই ছিদ্র দিয়া ঘরের ভিতর কি হইতেছে তাহা দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে একটা কালো কুঁজো বুড়ী, তার মাথা ভরা পাকাচুল, গাল্‌ দু'টো ঝুলো একটী ও দাঁত নাই, অতি বিশ্রী দেখিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে বুড়ীর পেছনে একে একে তেরোটা বাঘ আসিল। রাজা দেখিলেন এই তেরোটা বাঘের মধ্যে আবার দুইটা খুব বড় বাঘ—একটী খুব সুন্দরী মেয়েকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, মেয়েটির গলায় লোহার শিকল, সে শিকলের দুই দিক্‌ দিয়া ঝুলানো আবার দু'টা শিকল, সে শিকল দু'টা বাঘ দু'পায়ের দু'টো থাবা দিয়া ধরিয়া আছে। সব বাঘ গুলো একে একে বসিয়া পড়িলে ঐ যে বুড়ীটা, ওটাই বন-ডাইনী, সে বাঘ দু'টোকে বলিল: মেয়েটাকে গুহার ভিতর রেখে এস, তারপর তোমরা খাওয়া দাওয়া কর। বাঘ দু'টো যখন মেয়েটিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া লইয়া যায় তখন তারা রাজা যে সিন্দুকের ভিতর লুকাইয়াছিলেন সেখান দিয়াই যাইতেছিল। রাজা ভিতর হইতে দেখিলেন মেয়েটি কাঁদিতেছে, তাহার দুই চোখ দিয়া মুক্তার মত টল্‌ টল্‌ করিয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িতেছে। রাজার মনে হইল তিনি

এমন সুন্দরী মেয়ে জীবনে আর কখনো দেখেন নাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন. যে করিয়াই হয় এ-মেয়েটিকে উদ্ধার করিব। বাঘগুলো ফিরিয়া আসিয়া সকলে মিলিয়া খাবার খাইয়া ঘরের এদিকে সেদিকে যে যেখানে পারিল শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ঐ ডাইনী বুড়ীটা যখন দেখিল সব চুপ্‌চাপ্ তখন সেও ঘরের বাতিটা নিবাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

রাজা একে একে সব দেখিয়া মনে ভাবিলেন এইত সুযোগ! ধীরে ধীরে সিন্দুকের ডালাটা খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে বাহির হইলেন। চুপি চুপি এক পা দুই পা করিয়া হাঁটিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া সম্মুখে একটা লোহার দরজা দেখিতে পাইলেন। দরজা পার হইয়া দেখিতে পাইলেন একটা ছোট সিঁড়ি। সিঁড়ি বাহিয়া কিছু দূর নীচের দিকে গেলে মস্ত লোহার বেড়া দেওয়া ঘর। সেখানে ভয়ানক অন্ধকার। রাজা কিছুকাল সেখানে দাঁড়াইয়া শুনিলেন কে যেন সেখানে কাঁদিতেছে। রাজা কান্না শুনিয়া চুপি চুপি বলিলেন: কেগো তুমি কাঁদ্‌ছো? ভয় নেই. আমি তোমাকে উদ্ধার কর্‌তে এসেছি! রাজার একথায় খুব করুণ-সুরে কে যেন উত্তর দিল কে তুমি?

রাজা ধীর স্বরে বলিলেন: আমি একজন ভিখারী।

জানিনা তুমি কে? যদি এসেছ. তবে আমাকে এ-বিপদ থেকে মুক্ত কর। আমি গুজরাট দেশের রাজকন্যা—নাম কমলা।

ভয় নেই রাজকুমারী। যে রকমেই হউক আমি তোমায় রক্ষা কর্‌বো। কিন্তু তার আগে তোমার গলার সঙ্গে যে লোহার শিকলটা বাঁধা আছে এস সেটা ভেঙ্গে ফেলি। আগেই বলেছি যে. সেকালে সুজনসিংহের মত এত বড় বীরপুরুষ কেউ ছিল না। রাজা দু'হাতে শিকলটা ধরিয়া এমন জোরে টান মারিলেন যে, ঝনাৎ করিয়া শিকলটা দুইখন্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। রাজকন্যাকে মুক্ত করার পর ঘরের আর এক কোণ হইতে আর একটী ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। কে আর একজন বলিতেছে ওগো. বুড়ী ডাইনী. আমায় রক্ষে করো. আমায় বাঁচাও। আর আমায় কষ্ট দিও না! রাজা এ-শব্দ শুনিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন। একি! এ যে রতন, এ যে তাঁর আদরের নিধি, নয়নের মণি রতনের কন্ঠস্বর! রাজা পাগলের মত হইয়া যে দিক

হইতে রতনের গলার আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছিলেন সে-দিকে গেলেন, গিয়া দেখিলেন রাজকন্যা কমলার মত রতনের গলায় ও শিকল বাঁধা। রাজা শিকল দু'টা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং রতন ও রাজকন্যা কমলাকে সহ উপরে উঠিয়া আসিলেন। উপরের সেই ঘরের ভিতর আসিয়া দেখিলেন সেই ডাইনী বেটী ও তেরোটা বাঘ তখন ও নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে।

এইবার তিনজনে চুপি চুপি ঘর হইতে বাহির হইয়া বনের ভিতর আসিয়া পড়িলেন। মুক্ত আকাশের নীচে খোলা বাতাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া রাজপুত্র ও রাজকন্যার দেহে যেন নূতন জীবন আসিল। রাজা রাজকন্যাকে ও রতনকে একটা গাছের নীচে রাখিয়া আবার ঐ ঘরের দিকে আসিলেন ও বাহির হইতে কপাটটা এমন শক্ত করিয়া বন্ধ করিলেন যে, যেন সে ঘরের ভিতর হইতে আর কেহ বাহিরে যাইতে না পারে। দরজা বন্ধ করার পর সুজনসিং একটা চকমকি পাথর ঘষিয়া আগুণ প্রস্তুত করিয়া পলকের মধ্যে ঐ ঘরে আগুণ ধরাইয়া দিয়া মনের আনন্দে রতন ও রাজকুমারীর কাছে ফিরিয়া আসিলেন। দেখিতে দেখিতে দপ্ দপ্ করিয়া প্রবলবেগে আগুণ জ্বলিয়া উঠিল, ঘরের ভিতর হইতে সেই তেরোটা বাঘ ও ডাইনী বিকট চীৎকার ও গর্জ্জন আরম্ভ করিয়া দিল। সুজনসিংয়ের আনন্দ ধরে না। কিছুকাল পরে তিনি রাজকন্যা কমলা ও রতনকে সঙ্গে করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া দরবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। সে-ঘরের মাঝখানে সোণার সিংহাসন। তাহাতে হীরা-মণি মুক্তা জ্বলিতেছে। সিংহাসন খালি পড়িয়া আছে, কারণ রাজার ত আর খোঁজ নাই।

রাজা দর্পভরে সিংহাসনের উপর গিয়া বসিলেন এবং বলিলেন: আমি রাজা সুজনসিং, রাজ্যের অবস্থা স্বচক্ষে দেখ্‌বার জন্যই ভিখারী সেজে বের হয়েছিলুম। দরবার ঘরের চারিদিকে যে-সকল সৈনিক পাহারা দিতেছিল, তাহারা রাজার গলার স্বর শুনিয়া আনন্দে রাজাকে অভিবাদন করিল এবং 'জয় মহারাজার জয়' বলিয়া আনন্দ-ধ্বনি করিতে লাগিল। রাজাও তাহাদের সকলকে কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর তিনি সেই কোতোয়াল ও সদাগরকে ডাকাইয়া রাজকার্য্য হইতে বিদায় করিয়া দিলেন এবং

তাহাদের ধন-সম্পত্তি গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিলাইয়া দিবার আদেশ দিয়া উভয়কে ভিখারীর পোষাক পরাইয়া রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

তোমরা হয়ত মনে করিতেছ রাজা তাঁহার সেই সকল ভিখারী-বন্ধুদের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তা নয়. তিনি সম্পদের ভিতর আসিয়া একদিন দুঃখের মধ্যে যাহারা তাঁহার উপকার করিয়াছিল তাহাদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। রামশরণ, কাশীনাথ, কিষণলাল, কিশোরীলাল, রাজধানীতে আসিল। রাজা তাহাদের খুব সমাদরে গ্রহণ করিলেন। ঠিক আগেরি মত আনন্দে তাহাদের সহিত মেলামেশা করিলেন। তারা যে-বনে শিকার করিতে চাহিয়াছিল সে-বনে শিকার করিবার অনুমতি দিলেন ও নানাবিধ ধন-রত্ন উপহার সহ বিদায় দিলেন। আর সেই ক্ষুদ্র কুঁড়ের পরিবর্ত্তে সেখানে এক বিরাট অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল।

তারপর কি হইল? রাজকন্যা কমলার সঙ্গে রাজকুমার রতনের শুভদিনে শুভক্ষণে বিবাহ হইল। কত বাঁশী,—কত ঢাক-ঢোল বাজিল, কত দীন-দুঃখী পেট ভরিয়া খাইয়া দু'হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। রাজ্যে আবার পূর্ব্বের সে সুখ,—সে আনন্দ সব ফিরিয়া আসিল।

স্যাময়োজী

জাপান দেশে স্যাময়োজী তোকিয়োরি নামে এক রাজা ছিলেন। এমন দাতা, বুদ্ধিমান ও প্রজাহিতৈষী রাজা আর হয় না। কিসে প্রজার মঙ্গল হয়, রাজার দিনরাত কেবল ছিল ঐ চিন্তা। রাজা মন্ত্রীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে রাজ্যের অবস্থা খুব ভাল, সকলেই তাঁর প্রশংসা করে। স্যাময়োজী মনে মনে ভাবিলেন, মন্ত্রীরা যে সত্য কথা বলে তার প্রমাণ কি? হয়ত তোষামুদের দল মিথ্যা স্তোক-বাক্যে ভুলাইয়া রাজকার্য্যে অমনোযোগী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। না, এমন পরের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া কি তাঁহার রাজত্ব করা উচিত? এত বড় রাজ্য, না জানি কত নর-নারী নানারূপ কষ্ট পাইতেছে। আর তিনি রাজা হইয়া সে সব দীন-দুঃখী-প্রজার কষ্ট-যন্ত্রণা ভুলিয়া, পারিষদদের স্তুতি গানে প্রকৃত কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতেছেন। এইরূপ ভাবিয়া রাজ্যের বড় মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রচার করিয়া দিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এ-সংবাদে রাজ্যের সকল প্রজাদের মধ্যে একটা হাহাকার পড়িয়া গেল। হায়! হায়! এমন রাজা কি আর হবে? সকলের মুখে এই এক কথা। যথা সময়ে একটা শূন্য কবরের সিন্দুক সমাধিস্থলে চলিয়া গেল। সকলে জানিল রাজা স্যাময়োজী তোকিয়োরীর মৃত্যু হইয়াছে।

এদিকে রাজা দাঁড়ি গোঁফ কামাইয়া, মাথা মুড়াইয়া এক বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী সাজিলেন। সন্ন্যাসীর বেশে জাপানে যে ষাটটী প্রদেশ আছে, তাহা দেখিতে বাহির হইলেন। কত গ্রাম, কত সহর, কত বন, কত পাহাড় পার হইয়া যাইতে লাগিলেন। চারিদিকের অতুল শোভা-রাশি দেখিয়া মনে ভাবিলেন, কি সুন্দর এ-দেশ! কোথাও সবুজ গাছের সারি, কোথাও সাদা ধব্‌ধবে বড় বড় নদী, কোথাও নীল পাহাড়, মাথায় বরফের মুকুট পরিয়া উন্নত ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও ঝির্ ঝির্ করিয়া ঝরণা বহিয়া যায়, পাখীরা গান গায়। কি সুন্দর!

এ-সব দেখিয়া শুনিয়া রাজার মনে বড়ই আনন্দ হইল। এমনি করিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া দিন যায়।

রাজা একদিন শীতকালের অন্ধকার রাত্রিতে সানো নামে একখানা ছোট গ্রামের পাশ দিয়া যাইতেছেন। একে অন্ধকার রাত্রি, তাতে পাহাড়ের দেশ, পথ ঘাট অচেনা, কন্‌কনে শীতের বাতাস, হাড়ে—হাড়ে বহিয়া যাইতেছে। বরফ—বরফ—বরফ! সব বরফে ঢাকা! রাজার বড়ই কষ্ট হইতেছিল। আর এ কি বিপদ! এখন কোথায় গিয়া আশ্রয় পাইয়া নিজেকে বাঁচাইবেন? স্যাময়োজী আশ্রয়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া এদিক্‌ ওদিক্‌ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে খানিক দূরে একটী ছোট পাহাড়ের নীচে এক কৃষকের ক্ষুদ্র গৃহ হইতে প্রদীপের আলো বাহির হইতেছে দেখিয়া তাঁহার প্রাণে সাহস হইল। তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া সেখানে গিয়া পৌঁছিলেন। বেশ সুন্দর ছোট বাড়ীটি। খুব জোরে দরজায় ঘা দিতে দিতে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন— ওগো! কে আছ গো? দরজা খোল, আমি বড় বিপদে পড়েছি, আমায় রক্ষে করো। আমি একজন ক্লান্ত পথিক। রাজা পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলেন এটা কোন কৃষকের বাড়ী হইবে, কিন্তু দরজা খুলিয়া যখন একটী অতি সুন্দরী শিক্ষিতা মহিলা, বাহিরে আসিয়া বলিলেন: দেখুন! আমার বড়ই দুর্ভাগ্য যে এমন ঝড়-জলের মাঝখানেও একজন বিপদগ্রস্ত অতিথিকে ফিরিয়ে দিতে হ'ল। মশায় কি করবো বলুন, আমার স্বামী বাড়ী নেই, তিনি ঝড় জলের জন্য এখনো সহর থেকে ফিরে আসতে পারেননি, যদি তিনি বাড়ী থাক্‌তেন তা'হলে তিনি আপনাকে আশ্রয় দিতেন। আমি একা স্ত্রীলোক বাড়ীতে আছি, কি করে একজন অজানা পথিককে আশ্রয় দেব? আপনি এক কাজ করুন, এ-গ্রাম থেকে এক ক্রোশ দূরে—একখানি বড় গ্রাম আছে, সেখানে একটা সরাই আছে, আজকের মত নিশ্চয়ই সেথায় থাকতে পারবেন। একক্রোশ! তবেই হয়েছে, কি বিপদ! এই ভীষণ বরফ-পাতের মধ্যে আমি যে এক পাও যেতে পারবো না।

রাজা কি করিবেন? স্ত্রীলোকটীরও ত বিপদ কম নয়! কাজেই আবার সেই ভয়ানক কন্‌কনে শীতের মধ্যে তুষার-ঝটিকা ভেদ করিয়াই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উঁচু নীচু পথঘাট, এখানে একটা বড় পাথরের স্তূপ, ওখানে কতকগুলি ঝোঁপঝাপ! কার সাধ্য আর অগ্রসর

হয়? রাজা মনে ভাবিলেন এ-জন্মের মত এখানেই আমার মরণ লেখা আছে। আর রাজধানী কামাকুরায় ফিরে যেতে পাল্লেম না! স্যাময়োজী এইরূপ ভাবে পথ হারাইয়া একেবারে নিরাশচিত্তে সেই ক্ষুদ্র পাহাড়ের নীচেই দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এমন সময় দূরে একটা শব্দ শুনিতে পাইলেন কে যেন তাঁহাকে ডাকিতেছে। স্যাময়োজী অমনি চীৎকার করিয়া বলিলেন— ওকে! কেউ আমায় ডাকছো নাকি? এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পাইলেন একটী লোক তাঁহার দিকেই দৌড়াইয়া আসিতেছে। লোকটা নিকটে আসিয়া বলিল: 'আজ্ঞে হাঁ, আমিই আপনাকে ডাক্‌ছিলুম। এই মাত্র শহর থেকে ফিরে এসে দেখ্‌লুম, আমার স্ত্রী অতিথিকে বাড়ীতে স্থান দিতে না পারায় বড় মলিন মুখে বসে আছেন। ম'শায়, দয়া করে তাকে ক্ষমা করবেন, আর অনুগ্রহ ক'রে আমার সঙ্গে আমাদের আসুন।

.....গৃহকর্ত্রী ঘরের মধ্যে অতিথিকে যত্ন করিয়া বসাইলেন

গরীব মানুষ, বাড়ীটি খুব ছোট, তবু কি আর করবেন, কোন রকমে আজকে রাত্রির মত ও-বাড়ীতেই কাটাতে হবে। রাজা আশ্রয়ের জন্য হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখনে এ-লোকটির ভদ্রতা দেখিয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে খুব আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া সঙ্গে সঙ্গে সে-বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

গৃহকর্ত্রী অতিথির নিকট নিজ অভদ্র-ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, আর গৃহকর্ত্তা একখানি আসন আনিয়া ঘরের মধ্যে অতিথিকে যত্ন করিয়া বসাইলেন। স্যাময়োজী গায়ের কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া হাত পা ধুইয়া বেশ আরামের সঙ্গে বসিলেন। কৃষক-পত্নী অল্প সময়ের মধ্যে খাবার তৈরি করিয়া আনিয়া দিলেন—রাজা খুব তৃপ্ত হইয়া খাইলেন, তাঁর সারা জীবনে আর এমন তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া হয় নাই। আহার শেষ হইলে আগুণের পাশে বসিয়া তিনজনে নানা গল্প আরম্ভ করিয়া দিলেন। বাহিরে আগের মত বাতাস সোঁ সোঁ সাঁই সাঁই রবে বহিয়া যাইতেছিল। তেমনি তুষার-কণা ছড়াইয়া পড়িতেছিল। এদিকেও শীত বাড়িয়া উঠিল সঙ্গে সঙ্গে ঘরের জ্বালানী কাঠও ফুরাইয়া গেল।

এমন শীতের রাত্রিতে অতিথি সেবার জন্য জ্বালানী কাঠের খুব বেশী দরকার। একথা বলিয়াই গৃহকর্ত্তা বাহির হইতে পাইন, প্লাম, চেরি প্রভৃতি মূল্যবান কতকগুলি চারা গাছের একটী ঝুড়ি বোঝাই করিয়া ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং স্যাময়োজী বারণ করা সত্ত্বেও তাঁহার কথা না শুনিয়া মট্ মট্ শব্দ করিয়া গাছগুলো ভাঙ্গিয়া আগুণে ফেলিয়া দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন—দেখুন এ-চারাগাছগুলো কেমন জ্বল্‌ছে, আমি গাছগুলোকে খুব ভালবাস্‌তুম বটে, কিন্তু আজ আপনার ন্যায় একজন বিদেশী অতিথির সেবায় এগুলো জ্বালিয়ে যে আনন্দ পেলুম, কিছুতেই তার তুলনা হয় না। ঐ দেখুন না, পাইন গাছ কয়টী কেমন দপ্ দপ্ করে জ্বল্‌ছে।

গৃহস্বামীকে বেশ করিয়া আগুণটি জ্বালাইয়া দিয়া অতিথির সঙ্গে গল্প করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। নানা কথা চলিতে লাগিল। বর্ত্তমান রাজা লোক কেমন, রাজকার্য্য কেমন চলিতেছে, এসব কথা গৃহ-স্বামী বেশ বিজ্ঞ লোকের ন্যায় খুঁটিনাটি ভাবে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

স্যাময়োজীর কিন্তু এ-লোকটির আচার-ব্যবহার কথাবার্ত্তা ও শিষ্টতা-সভ্যতা দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই সন্দেহ হইয়াছিল যে, এ ব্যক্তি কোন মতেই একজন সামান্য কৃষক হইতে পারে না, নিশ্চয়ই এই স্বামী-স্ত্রী কোন ছদ্মবেশী শিক্ষিত নর-নারী।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া রাজা গৃহস্বামীকে বলিলেন—দেখুন, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো মনে ভাব্‌ছি, যদি আপনি কিছু মনে না করেন। গৃহস্বামী বিনীত ভাবে বলিলেন—আপনি থতমত কচ্ছেন কেন? অনায়াসে জিজ্ঞেস করুন!

রাজা বলিলেন দেখুন আপনাদের কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার দেখে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছে যে, আপনারা কখনো সাধারণ কৃষক নন, যদি তেমন কোন বাধা না থাকে, তবে আপনাদের পরিচয় দিলে বড়ই বাধিত হ'ব।

গৃহস্বামী একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন: আপনার অনুমান যথার্থই, কিন্তু তা বলে আমার নাম কিছুতেই বল্‌ছিনি।

স্যাময়োজীও কম পাত্র নন, কিছুতেই ছাড়লেন না। শেষটায় বাধ্য হইয়া গৃহস্বামীর নাম প্রকাশ করিতে হইল। তিনি একটী দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন: আপনার অনুমান যথার্থ। বাস্তবিকই আমি কৃষক নই, আমি একজন সামুরাই। আমার নাম গেঞ্জেইমোন নোজোসুনিয়ো।

কি? আপনি বিখ্যাত সামুরাই গেঞ্জেইমোন নোজো? কি জন্য সহরের সব সংশ্রব পরিত্যাগ করে আপনি এ-বিজন প্রান্তরে এসে বাস কচ্চেন?

আর সত্য গোপন করে কি হবে! আমি একবার দূর দেশে যুদ্ধ কর্‌তে গিয়েছিলুম, সেই সুযোগে আমার এক পাপিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র আমার বিষয়-সম্পত্তি অধিকার ক'রে বসেছিল, তারি ফলে আজ আমি একেবারে পথের ভিখারী। স্যাময়োজী গৃহস্বামীর কথা শুনিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া তাহার নিকটে গিয়া বসিলেন এবং বলিলেন: মশায়, এ সত্যি বড় অন্যায় কথা। আপনি রাজধানী কামাকুরা গিয়া এ-বিষয়ে রাজাকে জানাননি কেন? তা'হলে নিশ্চিতই তিনি এর সুবিচার কর্‌তেন।

হাঁ, আমি 'রাজার কাছে বিচারপ্রার্থী হ'ব বলেই ঠিক

করেছিলুম, কিন্তু সে সময়ে শুনতে পেলুম যে দয়ার সাগর নরপতি স্যামুরাই তোকিয়োরী প্রাণত্যাগ করেছেন। বর্ত্তমান রাজকুমার টোকিমুনি একেবারে ছেলে মানুষ, তাঁর কাছে সুবিচার নাও পেতে পারি, এসব দশদিক বিবেচনা করেই বিষয়ের আশা-ভরসা ছেড়ে দিয়েছি। যদিও আমাকে বাহ্যিক ভাবে কৃষক ব'লেই মনে করেন, কিন্তু এখনও আমি যে সামুরাই ছিলুম, সে সামুরাই আছি। কাল যদি শুনতে পাই, একটা যুদ্ধ হ'বে, তাহ'লে অমনি আমার পুরাণো ঢালখানা আর প্রাচীন

একি: এযে পরিচিত কণ্ঠ!—একি সেই অতিথি!

তরোয়ালখানা হাতে ক'রে আমার এই বুড়ো লড়াইয়ের ঘোড়াটিতে চড়ে রাজধানীতে গিয়ে হাজির হ'ব। যদি হেঁটে যেতে হয়, তাহ'লেও পিছু পা হ'ব না। মরি, সেও ভাল তবু সামুরাই কখনও স্বদেশপ্রীতি বিস্মৃত হয় না। এইরূপ কথায় কথায় গেঞ্জিমনের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল। রাজা তাহার বীরত্ব পূর্ণ-বাণী, অসীম তেজ ও সাঁহসিকতার পরিচয় পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন।

এরূপ ভাবে গল্প করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়াছে দেখিতে পাইয়া স্যামেয়োজী বলিলেন—আপনার আতিথ্যে আমি বড়ই উপকৃত হ'য়েছি। আমি এখুনি রওয়ানা হ'বো, আমাকে অনেক দূর যেতে হবে। জগদীশ্বরের অনুগ্রহ হ'লে একদিন নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে কামাকুরায় দেখা হ'বে। গেঞ্জিমোন এবং তাঁহার স্ত্রী অতিথিকে সেদিন থাকিবার জন্য খুব অনুরোধ করিলেন, কিন্তু রাজা কিছুতেই থাকিতে স্বীকার হইলেন না। আতিথ্যের জন্য স্বামী-স্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাইয়া পুনরায় যাত্রা-পথে বাহির হইলেন।

বৎসর শেষ হইয়াছে। বসন্তের নবীন শোভা-সম্পদে ধরণী পুলকিত! এমন মধুর সময়ে রাজধানী হইতে দেশের সর্বত্র যুদ্ধের জন্য সকলকে প্রস্তুত হইবার লিখিত রাজাদেশ প্রচারিত হইল। গেঞ্জিমোন তাঁহার ছোট গ্রাম হইতেও এসংবাদ শুনিতে পাইলেন। যেমন সংবাদ পাওয়া অমনি তাঁহার পুরাণা ঢাল ও তরোয়ালখানা হাতে করিয়া বুড়ো ঘোড়াটিতে চড়িয়া রাজধানীতে গিয়া পেঁীছিলেন। গেঞ্জিমোনের রাজধানীতে পেঁীছিবার পূর্বে রাজ্যের আর সব সামুরাইরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

সকল সামুরাইদের সঙ্গে অনুচর, সোণা রূপার কাজ করা মাথায় উষ্ণীষ, গায়ের মূল্যবান জামা সূর্য্যের কিরণে ঝক্‌মক্ করিয়া জ্বলিতেছে। সকলে একদিকে সাজিয়া গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর দরিদ্রবেশে গেঞ্জিমোন আসিয়া একদিকে দাঁড়াইলেন। তাঁহার দীন-হীন-বেশ দেখিয়া সকলে তাঁহার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল: দেখ্ দেখ্ ঐ ভিখারী সৈনিকটাকে দেখ্। এইভাবে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সকলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতেছে, এমন সময় রাজ-বাড়ী হইতে সংবাদ আসিল তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ রাজপ্রাসাদে যাইতে হইবে। গেঞ্জিমোন ত তলব শুনিয়া অস্থির! কি বিপদ! রাজ-বাটী

হইতে বিশেষ করিয়া তাহারি তলব কেন? উঃ হয়েছে! নিশ্চয়ই তার এই অদ্ভুত পোষাকের জন্য ভর্ৎসনা করিতে রাজা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। ভয়ে ভয়ে গোঞ্জিমোন রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। প্রথমেই তাঁহার সঙ্গে রাজপুত্রের সাক্ষাৎ হইল। গোঞ্জিমোন তাঁহাকে প্রণাম করা মাত্রই রাজকুমার বলিলেন: গোঞ্জিমোন, তোমার সঙ্গে একটী লোক কিছু আলাপ কর্‌তে চাচ্ছেন। রাজকুমারের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পাশের একটী কক্ষের দ্বার খুলিয়া একজন লম্বা পোষাক পরা বৌদ্ধ-ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গোঞ্জিমোনকে লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলেন: গোঞ্জিমোন তোমার সঙ্গে এ-সাক্ষাতের জন্য অনেকদিন থেকেই অপেক্ষা কর্‌ছি। একি! এযে পরিচিত কন্ঠস্বর! গোঞ্জিমোনের মনে হইল, এস্বর যেন পূর্ব্বে আর কোথাও শুনিয়াছেন। বাঃ-এই যে মনে হ'য়েছে, এ-বৌদ্ধ ভিক্ষুই না কিছুদিন আগে আমার বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলেন। একথা মনে হওয়া মাত্রই গোঞ্জিমোন বলিলেন—দেখুন আপনিই না কিছুদিন আগে আমার গৃহে অতিথি হ'য়েছিলেন?

হাঁ, ঠিক্ কথা, তবে কি জানেন, গতবারের পুরোহিতই এবার স্যাময়োজী তোকিয়োরী হ'য়েছে।

অ্যাঁ, সে কি? আমার বেয়াদবি মাপ করবেন, আমি কি অন্যায় করেছি! আপনাকে চিনতে পারিনি, অতএব দয়া ক'রে আমার সকল ত্রুটি মাপ করুন, আমার কথা বিশ্বাস করুন।

স্যাময়োজী হাসিতে হাসিতে গোঞ্জিমোনের নিকট আসিয়া বলিলেন—বন্ধু, তুমি তোমার যথাযোগ্য অতিথির সেবা করেছ, সে জন্য ক্ষমা চাইবার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি আমাকে বলেছিলে যে, তুমি যদিও দরিদ্র হ'য়েছ, তবু অন্তরে ঠিক্ 'সামুরাই'ই আছ; রাজার আদেশ পেলেই রাজধানীতে উপস্থিত হ'বে। তুমি তোমার কথামত কাজ করেছ, সে-জন্য তোমার বিষয়-সম্পত্তি পুনরায় তোমাকেই দেওয়া গেল। কিন্তু গোঞ্জিমোন তুমি ভীষণ তুষার-ঝটিকায় শীতের রাত্রিতে তোমার নিজের অতি প্রিয় চারা গাছগুলি ধ্বংস ক'রে যে অতিথির সেবা করেছ, সে-জন্য তোমাকে আমি মাসুইদা, উমেদার ও সেকুরার সম্পত্তি দান কল্লুম।

গোঞ্জিমোন আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় আর কোন কথা

মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলেন না, কেবল রাজাকে বারবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। তারপর গোঞ্জিমোন পুনরায় অন্যান্য সামুরাইদের নিকট ফিরিয়া গেলেন, তখন, সকলে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া রহিল। এইরূপ ভাবে স্যাময়োজী তোকিয়োরী তদীয় মহানুভবতার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আরও যশস্বী হইয়া উঠিলেন। গোঞ্জিমোনের ও রাজার অনুগ্রহে সুখে দিন যাইতে লাগিল।

তিনটি লেবু

জালন্ধর দেশের রাজা রাওমলের একটী মাত্র ছেলে। নাম সুরযমল। সবে ধন নীলমণি। রাজার সব আশা ভরসা ঐ এক ছেলের উপর। রাওমল বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তিনি ভাবিতেন, আমি দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িতেছি, সুরযমলকে বিবাহ দিয়া সিংহাসনে বসাইতে পারিলেই আমার সুখ। রাজা তাড়াতাড়ি ছেলের বিবাহ দেওয়ার জন্য অস্থির—আর ওদিকে রাজপুত্র বিবাহের নামও শুনিতে পারেন না। যদি কখন কোন ভাট রাজপুরীতে আসিয়া রাজার নিকট কোন দেশের কোন রাজকন্যার গল্প করিতে আরম্ভ করিত, আর দৈবাৎ যদি রাজপুত্র সে-কথা শুনিতে পারিতেন তবে অমনি সেখান হইতে পলাইয়া যাইতেন। রাজা কত অনুরোধ করিলেন, ভয় দেখাইলেন, শাসন করিলেন, কিন্তু কোনরকমেই রাজপুত্রের আর মতি ফিরিল না। রাণী কত কাঁদিলেন, কত অনুরোধ উপরোধ করিলেন, এমন কি রাজমন্ত্রীরা পর্য্যন্ত রাজপুত্রকে কত বুঝাইলেন, কিন্তু কোন সুফলই হইল না—রাজপুত্রের ঐ এক কথা—বিবাহ করিব না।

বিধাতার আশ্চর্য্য বিধান! যে-বিবাহের জন্য রাজকুমারকে এত অনুরোধ করিয়াও কেহ সফলকাম হইতে পারিলেন না—একদিন একটা সামান্য ঘটনায় রাজকুমারের মতি ফিরিয়া গেল। একদিন রাজপুত্র ছুরি দিয়া একটি আপেল কাটিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়ায় তাহার আঙ্গুলের খানিকটা কাটিয়া গেল, তার হাতের সেই রক্ত এক-বাটী দুধের মধ্যে পড়িয়া এমন একটা সুন্দর গোলাপী রং হইল যে রাজপুত্র অবাক্ হইয়া সে দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন যদি এমন কোন রাজকন্যা দেখিতে পাই, যাহার গায়ের রং এমনি গোলাপী তবেই তাকে বিবাহ করবো, নচেৎ এ-জীবনে আর বিবাহ করবো না। রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্রকে দিয়া রাজার কাছে বলিয়া পাঠাইলেন, আমার ইচ্ছামত রাজকুমারীর সন্ধানে আমাকে যাইতে দিন।

রাজা ছেলের অদ্ভুত খেয়ালের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, তাকে এই সংকল্প হইতে ফিরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে কোনরূপেই রাজপুত্রের মতি ফিরিল না, তখন সস্নেহে পুত্রকে বলিলেন,— বাছা, যখন তুমি যাওয়ার জন্যই সংকল্প করেছ, তখন আর তোমাকে বারণ করবো না, টাকাকড়ি যত পার সঙ্গে নাও, লোকজন নাও। দেখ বাবা! পথে যেন কোন কষ্ট না হয়। বুঝতেই পার তোমার এই বুড়ো বাপ-মা, তুমি বাড়ী থেকে চলে গেলে কি কষ্টে দিন কাটাবে। যত তাড়াতাড়ি পার বাড়ী ফিরে এস। অন্যান্য সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া অজানা পথঘাট ধরিয়া অজানা দেশের উদ্দেশ্যে রাজপুত্র রওয়ানা হইলেন।

রাজপুত্র রাজধানী ছাড়িয়া কত মাঠ, কত বন, কত পাহাড়, কত নদী, কত দেশ পার হইয়া গেলেন, কত ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকজন, রীতি-নীতি দেখিলেন কিন্তু কোথাও তার সেই মনের মত রাজকন্যা জুটিল না। রাজপুত্র যতই নিরাশ হন, তার জেদ আরও তত বাড়িয়া উঠে, শেষটায় ঘুরিতে ঘুরিতে এক রাক্ষসের দেশে গিয়া পোঁছিলেন। কাছে লোকজন একটীও নাই, দেখিলেন একটা মস্ত বড় বাড়ী। রাজপুত্র বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যাইতে যাইতে রাজপুত্র দেখিতে পাইলেন যে একটা বুড়ী দেয়ালের ধারে বসিয়া আছে। বুড়ীকে দেখিতে পাইয়া রাজপুত্র প্রণাম করিয়া, তাকে একে একে সব মনের কথা বলিলেন। বুড়ীর রাজপুত্রের উপর একটু দয়া হইল, সে বলিল: বাছা! আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, যত শীঘ্র পার, এখান থেকে পালাও—কিসের এ-দেশ তুমি বাপু জাননা, এ হচ্ছে রাক্ষসের দেশ, আমিও একজন রাক্ষসী, আমার তিন মেয়ে আছে, তারা এখন বনের মাঝে শিকার খুঁজতে গেছে, তারা যদি এসে তোমায় দেখ্‌তে পায়, তাহ'লে তখনি কচ্‌মচ্‌ ক'রে খেয়ে ফেলবে। তোমায় দেখে আমার দয়া হয়েছে, তাই বলছি, যত তাড়াতাড়ি পার এখান থেকে পালাও, আমার মেয়েরা এসে পড়লে কিন্তু বাছা তোমায় আমি বাঁচাতে পারব না।

রাজপুত্র বুড়ীর কথা শুনিবা মাত্রই তীরের মত বেগে দোঁড়াইতে আরম্ভ করিলেন, দৌড়াইতে দৌড়াইতে এক রাজার রাজ্য ছাড়িয়া যখন আর এক রাজার রাজ্যে আসিয়া পড়িলেন

তখন তাহার প্রাণে নূতন বল হইল! একটা বড় গাছ-তলায় খানিক বিশ্রাম করিয়া আবার ধীরে ধীরে পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে তিনি এক মাঠে গিয়া পড়িলেন। সেখানে দেখিলেন, লাঠির মাথায় অনেক নরমুন্ড শোভা পাইতেছে এবং শকুনি গৃধিনী সব পচা মাংস খাইতেছে। রাজপুত্র ওখানে যাওয়ার পরই নরমুন্ডগুলি হি-হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। সেই হাসির কি শব্দ, যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে আর কি?ইহা দেখিয়া রাজপুত্রের বড় ভয় হইল। নিকটে খড়ের কয়েকখানা ঘর ছিল। ইহার মধ্যে যে খানা বড়, তার মধ্যে রাজপুত্র ঢুকিয়া একখানা আসনের উপর একটা বুড়ী বসিয়া আছে দেখিতে পাইলেন। এবুড়ীটা আগের সেই বুড়ী রাক্ষসীর চেয়েও দেখিতে বিশ্রী। রাজপুত্র এ বুড়ীকেও প্রণাম করিয়া নিজের মনের কথা বলিলেন। এ বুড়ী এক পেত্নী, সে রাজপুত্রকে বলিল: বাছা, এ ভূতের দেশ, আমার পেত্নী মেয়েরা সব বাইরে গেছে, যদি তারা এসে তোমায় দেখ্‌তে পায়, তবে অমনি মেরে ফেলবে, যদি বাঁচতে চাও তবে এখুনি পালাও। রাজপুত্র আবার প্রাণভয়ে নক্ষত্রবেগে দৌড়াইতে দৌড়াইতে আর এক রাজার রাজ্যে আসিয়া পড়িলেন। এখানেও এক রাস্তার ধারে আর একটা বুড়ীর সঙ্গে দেখা হইল। রাজপুত্র এ বুড়ীকেও প্রণাম করিলেন। বুড়ী মিষ্টি কথা বলিয়া রাজপুত্রকে তাহার এক পাশে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাছা তুমি কি চাও? তুমি কোথা থেকে এসেছ। রাজপুত্র একে একে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। বুড়ী বলিল, তাইত বাছা! তোমার বড় কষ্ট হয়েছে, তুমি বাপু আগে কিছু খেয়ে একটু স্থির হও—একথা বলিয়া বুড়ী তার হাতের ঝুড়ি হইতে নানারকমের সুস্বাদু ফলমূল বাহির করিয়া খাইতে দিল। রাজপুত্র এমন মিষ্ট ফল আর কখনো খান নাই, ফলমূল খাইয়া যখন একটু সুস্থির হইলেন তখন ঐ বুড়ী রাজপুত্রকে তিনটি লেবু এবং সেই লেবু তিনটি কাটিবার জন্য একখানা ছুরি দিয়া বলিল, বাছা! তুমি এখন যত তাড়াতাড়ি পার বাড়ী চলে যাও, তুমি যা চাচ্ছিলে তা এখন পেয়েছ! যখন তুমি তোমার বাবার রাজ্যের সীমানায় গিয়া পৌঁছবে, তখন সে যায়গায় যে কুয়োটি সকলের আগে তোমার চোখে পড়বে, তুমি সেখানে বসে, প্রথমে একটী

লেবু কাটবামাত্রই একটী পরী বের হবে, বের হ'য়েই সে তোমার কাছে জল খেতে চাবে, তুমি যত তাড়াতাড়ি পার, কুয়ো থেকে জল তুলে তাকে খেতে দিও, যদি খুব তাড়াতাড়ি তাকে জল খাওয়াতে না পার তা হ'লে তাকে আর পাবে না। সে পলক না যেতে যেতে উড়ে পালাবে। সে চলে গেলে অমনি আর একটি লেবু কাটবে, আবার আগের মত একটি পরী আসবে তাকেও যদি জল দিতে না পার সেও উড়ে পালাবে। প্রথম দ্বিতীয় পরী উড়ে যাক্, তাতে তত ক্ষতি নাই, কিন্তু দেখ খুব সাবধান, তৃতীয় পরীটি যেন না যেতে পারে, তাকে খুব তাড়াতাড়ি জল খেতে দিও, কারণ সেই হচ্ছে তোমার মনের মত মেয়ে।

রাজপুত্র তিনটী লেবু ও ছুরিখানা হাতে লইয়া নিজ রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, নানা বিপদ, নানা দেশ পার হইয়া একদিন বিকাল বেলা নিজ দেশের সীমানায় আসিয়া পৌঁছিলেন। জায়গাটি অতি সুন্দর, চারিদিকে বড় বড় গাছ ছায়া করিয়া আছে, গাছের ছায়ায় একটি সুন্দর কুয়া, কুয়ার চারিদিকে সবুজ মকমলের মত ঘাস, পাখীরা গাছের ডালে বসিয়া মনের আনন্দে গান করিতেছে। রাজপুত্র ঐখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, অপরাহ্নের শীতল বাতাসে তাহার প্রাণ জুড়াইয়া গেল। এইবার বুড়ীর কথানুসারে প্রথম লেবুটী কাটিলেন, কাটিবামাত্রই বিদ্যুতের ঝলকের মত রাজপুত্রের চক্ষের সামনে একটী পরমা সুন্দরী কন্যা আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার গায়ের রং দুধে আলতা গোলার মত, লম্বা কালো চুল, নীল ডাগর চোখ, যেন ছবিটি। সে রাজপুত্রকে বলিল: ওগো! আমার বড় তৃষ্ণা পেয়েছে, আমায় একটু জল খেতে দাও। রাজপুত্র কেমন হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলেন, তাই তাড়াতাড়ি আর জল দিতে পারিলেন না,—মেয়েটি যেমন আসিয়াছিল, তেমনি কোথায় যে মিলাইয়া গেল, রাজপুত্র কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। দ্বিতীয় লেবুটী কাটিবামাত্র আর এক কন্যার আবির্ভাব হইল, সেও রাজপুত্রের নিকট জল চাহিল এবং জল না পাইয়া চলিয়া গেল। এবার রাজপুত্রের অদৃষ্ট পরীক্ষা। রাজপুত্র মনে মনে ভাবিলেন, এইবার শেষবার, যেরূপেই পারি পরী কন্যাকে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করিব। শেষ লেবুটী কাটিবামাত্রই তৃতীয় কন্যা হাজির হইল, অন্য দুই কন্যার

ন্যায় তৃতীয় কন্যাও জল চাহিল। রাজপুত্র এবার বিশেষ সতর্ক ছিলেন; জল চাওয়া মাত্রই কূপ হইতে অতি তাড়াতাড়ি শীতল জল তুলিয়া একটী পাত্রে করিয়া তাহা ঐ কন্যাকে পান করিতে দিলেন। জল পান করিয়া সেই পরী রাজপুত্রের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। তার গায়ের রং দুধের মত সাদা এবং রক্তের মত লাল টুকটুকে পায়ের তলা। সোণার মত চুল, ফুটন্ত গোলাপের মত ঢলঢলে হাসি হাসি মুখখানি, চোখ দুটি যেন সন্ধ্যার তারা, তেমনি দীপ্ত, তেমনি হীরার মত জ্বলজ্বলে।

রাজপুত্র মেয়েটিকে দেখিয়া মিনতি করিয়া বলিলেন: আমি তোমাকে বিয়ে করবো, তোমাকে আমার সাথে যেতে হবে, যখন তুমি আমার রাণী হ'বে তখন তোমাকে তেমন ক'রে সাজিয়ে নেওয়াই উচিত। আমি রাজধানীতে যাই, সেখান থেকে যত তাড়াতাড়ি তোমার জন্য বসন-ভূষণ যান-বাহন নিয়ে আসতে সময় যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই বড় গাছটার কোটরে লুকিয়ে থাক। পরীকন্যা সম্মত হইয়া গাছের কোটরের মধ্যে লুকাইয়া রহিল।

রাজপুত্র চলিয়া যাওয়ার খানিকক্ষণ পরে, কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সুন্দরী কন্যাটী কোটরের ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া নীচে কোথায় কি হইতেছে তাহাই দেখিতে লাগিল, কিছুক্ষণ পরে একটা কালো রংয়ের অতি কুৎসিত স্ত্রীলোক, বোধ হয় কোন সদাগরের বাড়ীর চাকরাণী হইবে, সেই কূয়া হইতে জল নিবার জন্য কলসী কাঁখে করিয়া আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। জল তুলিতে গিয়া জলের মধ্যে সে পরীর মুখের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইয়া মনে করিল, এ নিশ্চয়ই তাহারি মুখের ছায়া। সে এমন সুন্দরী, আর তার কিনা সদাগরণীর ঝাঁটা খেতে খেতেই দিন যায়! না আর আমি দাসীগিরী করবো না। যেমন কথা, তেমন কাজ। কলসীটি একটা পাথরের উপর ঘা দিয়া ভাঙ্গিয়া দাসী সদাগরের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। সদাগরের স্ত্রী দাসীকে এত দেরীতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: তুই যে খালি হাতে ফিরে এলি? কোথায় এত দেরী করলি?

সে বলিল— কি করবো মা, জল ভরা কলসী নিয়ে বাড়ী ফিরে

আসছিলুম, আসবার সময় একটা পাথরে হোঁচট্ লেগে পড়ে যাই, তাতেই কলসীটা ভেঙ্গে গেছে।

তা যা হবার, হয়েছে, এই কুঁজোটায় ক'রে জল নিয়ে আয়গে যা। এইরূপ বলিয়া সদাগরণী চাকরাণীর হাতে একটা কুঁজো দিয়া জল আনিতে পাঠাইয়া দিলেন। দাসী সেই কুঁজোটী লইয়া আবার সেই কুয়ো হইতে জল নিতে আসিল। সে আবার কুয়োর ভিতরে পরীর মুখের প্রতিবিম্ব দেখিয়া উহা নিজেরই মুখের

না—না আর আমি দাসীপনা করবোনা

ছায়া মনে করিয়া বলিয়া উঠিল— হায়! আমি এমন সুন্দরী, আমার কি আর দাসীপনা পোষায়? না না কখনো না, আর আমি দাসীপনা ক'রবো না। আর সদাগরের বাড়ী যাচ্ছিনে। রইলো এই কুঁজো প'ড়ে। এইরূপ বলিয়া সে কুঁজোটি আছাড় দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। এইবার পরী হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না; সে গাছের উপর হইতে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। দাসীটা এদিক ওদিক চাহিয়াও বুঝিতে পারিল না কে কোথা হইতে হাসিতেছে। তারপর যখন উপর দিকে চাহিয়া গাছের উপরে পরীকে দেখিতে পাইল, তখন আর তাহার রাগের সীমা রহিল না। মনে মনে বলিল, বুঝেছি, তুমিই যত নষ্টের গোড়া, তোমারি জন্যে আমার মনিবের স্ত্রীর ঝাঁটা খেতে হলো—আচ্ছা রসো, তোমায় মজা দেখাচ্ছি। প্রকাশ্যে মিষ্ট স্বরে বলিল: হ্যাঁগা! তুমি কে গা?......

পরী সরল মনে আগাগোড়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা দাসীকে বলিল। দাসীর মনে কুমতি জাগিয়া উঠিলেও মুখে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া বেশ মিষ্টি ভাবে বলিল: হ্যাঁগা, তোমার বর আস্‌বে, তুমি সাজ্‌বে গুজ্‌বে না? আহা! এমন সুন্দর লম্বা সোণার রংয়ের মত চুলগুলো বেঁধে দিতুম। পরী সরল ভাবে দাসীর কথাগুলি গ্রহণ করিয়া তাহাকে উপর হইতে হাত বাড়াইয়া ধীরে ধীরে গাছের উপরে সেই কোটরের মাঝখানে তুলিয়া লইল, দাসী এবার নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল, সে পরীর চুল বাঁধিবার ছল করিয়া তাহাকে নিজের মাথার চুলের কাঁটা দিয়া এমনি আঘাত করিতে লাগিল যে পরী বেদনায় কাতর হইয়া বলিল—'বুলবুল'—অমনি সে একটা বুলবুল পাখীর রূপ ধারণ করিয়া উড়িয়া পলাইল।

এদিকে রাজপুত্র সাজ-সজ্জা লোক-জন, যান-বাহন সহ সেই গাছের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া যখন দেখিলেন যে সেই সুন্দরী কন্যার পরিবর্ত্তে একটা যার-পর-নাই কুৎসিতা স্ত্রীলোক বসিয়া রহিয়াছে, তখন আর তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দাসী রাজপুত্রের মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিল: ওগো রাজ-কুমার, তুমি অবাক্ হচ্চ কেন? আমিই সেই পরী, তুমি যাওয়ার পরে একটা দুষ্ট যাদুকর আমাকে এইরূপ কুৎসিত আকারে পরিবর্ত্তন করেছে। বেচারা রাজপুত্র আর কি করেন? ঐ দাসীটার

কথা বিশ্বাস করিয়া তাহাকে গাছ হইতে নামাইয়া নানাবিধ সাজ-পোষাক পরাইয়া ধূম-ধামের সহিত রাজধানীতে লইয়া চলিলেন।

রাজপুত্রের মুখে পরীর কথা শুনিয়া রাজা, রাণী, মন্ত্রী, সভাসদ্ এবং বহু গণ্যমান্য লোক রাজধানী হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রাজপুত্রের আগমনের অপেক্ষা করিতেছিলেন। যখন তাঁহারা রাজপুত্রের সহিত এই কুৎসিতা স্ত্রীলোকটাকে দেখিতে পাইলেন, তখন আর তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। রাজারাণী আর কি করিবেন? হাজার বিশ্রী হউক, যখন তাঁহাদের ছেলে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে, তখন আর কোনমতেই ত অবহেলা করা চলে না। কাজে কাজেই মনের দুঃখ গোপন করিয়া সকলে ধূম-ধামের সহিত রাজধানীতে গেলেন এবং পুত্র ও পুত্র-বধূকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহারা তীর্থস্থানে বাস করিবার জন্য চিরদিনের জন্য রাজ্য-ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

রাজপুত্র মনের দুঃখে কাল কাটাইতেছেন। কোথায় দেব-কন্যার ন্যায় সুন্দরী পরী আনিয়াছিলেন, আর কিনা তার পরিবর্ত্তে একটা অতি কুৎসিতা স্ত্রী লইয়া মনের কষ্টে শত অশান্তিতে দিনাতিপাত করিতেছেন।

বিচিত্র ঘটনা। একদিন রাজবাড়ীর পাঁড়ে ঠাকুর সন্ধ্যাবেলা রাজবাড়ীর কিছু দূরে এক বাগানের ধার দিয়া যাইতেছে, এমন সময় সে দেখিতে পাইল যে, একটী সুন্দর বুলবুল বড় বকুল গাছের ডালে বসিয়া তাহাকে বলিতেছে:

"বামুন ঠাকুর! বামুন ঠাকুর! বল সত্যি ক'রে,
রাজা আর কালোরাণী এখন কি গো করে?"

পাঁড়ে ঠাকুর পাখীটাকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিল, কিন্তু ধরিতে পারিল না। এক দিন যায়, দু'দিন যায় তিন দিন যায় প্রত্যহই সন্ধ্যাকালে ঐ রাস্তা দিয়া যাওয়ার সময় পাখীটাকে বলিতে শুনা যায়:

"বামুন ঠাকুর! বামুন ঠাকুর! বল সত্যি ক'রে,
রাজা আর কালোরাণী এখন কি গো করে?"

পাঁড়ে ঠাকুর একদিন কথায় কথায় এই পাখীটির কথা কালোরাণীকে বলিলেন। কালোরাণী ঐ পাখীটা ধরিয়া তাহার মাংস রান্না করিয়া খাওয়াইবার আদেশ করিলেন। বামুনঠাকুর যে বকুল গাছে প্রতিদিন অপরাহ্নে পাখীটি আসিয়া বসিয়া গান করিত সে গাছের ডালে

জাল পাতিয়া রাখিল এবং পরদিন জালের দ্বারা পাখীটা ধরিয়া কালোরাণীর কথামত উহার মাংস রাঁধিয়া রাণীকে খাইতে দিল। পাখীটাকে মারিয়া মাংস প্রস্তুত করিবার সময় তার গায়ের পালক গুলো বামুন ঠাকুর রান্নাঘরের জানালার ভিতর দিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। কি আশ্চর্য্য! যেখানে পালকগুলো পড়িয়াছিল, কিছু দিন বাদে ঠিক সে যায়গা হইতে একটী সুন্দর সতেজ লেবুর গাছ জন্মিল। একদিন ভোরের বেলা রাজা সেই দিক দিয়া বেড়াইতে ঐ লেবু গাছটি দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইলেন এবং পাঁচক ঠাকুরকে ডাকিয়া গাছের জন্ম-কথা শুনিয়া বলিলেন: দেখ, সাবধান! এ-গাছের একটী পাতাও যেন কেউ নষ্ট না করে, নষ্ট করলে তার গর্দ্দানা যাবে। ক্রমে গাছটি বড় হইল এবং দেখিতে দেখিতে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সে গাছে তিনটী লেবু হইল। এই লেবু তিনটী—সেই যে বুড়ী রাজপুত্রকে তিনটী লেবু দিয়াছিল ঠিক তাহারি মত। লেবু তিনটী বড় হইলে রাজপুত্র তিনটী লেবুই ঘরে লইয়া গেলেন. এবং সেই বুড়ীর দেওয়া ছুরিখানা দিয়া একটি একটি করিয়া কাটিতে লাগিলেন। যেমন কাটা, অমনি আগেরি মত একটি পরী আসিয়া উপস্থিত হইল এবারও পূর্ব্বের মত রাজার নিকট জল প্রার্থনা করিল। আগেরি মত দুইটী পরী জল না পাইয়া উধাও হইয়া চলিয়া গেল। তৃতীয় লেবুটি যেমন কাটিলেন, অমনি তাহার হারানিধি, সেই রূপসী পরীর আবির্ভাব হইল, আগেরি মত জল প্রার্থনা করিবামাত্র রাজপুত্র স্বর্ণপাত্রে করিয়া শীতল জল দান করিলেন। পরী রাণী হাসি মুখে আসিয়া রাজার পাশে দাঁড়াইল এবং একে একে কালোরাণীর ছলনার কথা বলিল।

রাজা আনন্দে অধীর, তিনি এতদিনে বুঝিতে পারিলেন যে কিরূপ ভাবে তিনি একটা ক্রীতদাসীর দ্বারা প্রতারিত হইয়াছিলেন। তিনি পরী কন্যাকে নানা জাঁকজমকের পোযাকে সাজাইয়া মুকুট পরাইয়া দরবার কক্ষে গমন করিলেন এবং রাজ্যের ছোট-বড় সকলকে ডাকাইয়া এক মস্ত দরবার ডাকিয়া পরী-রাণীকে রাণীরূপে গ্রহণ করিয়া সভাসদ্‌গণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: আমার এই রাণীকে প্রতারণা ক'রে নানারূপ যেকষ্ট দিয়েছে, তোমরা সকলে বল, সে কি শাস্তি পাবার যোগ্য? সভাসদ্‌গণের মধ্য হইতে নানা জন নানা কথা

বলিল, কেহ বলিল, অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে হত্যা করা উচিত। কেহ বলিল, হাত পা বেঁধে পাহাড়ের ওপর হ'তে ফেলে দেয়া উচিত। কাহারো কথাই রাজার মনের মত হইল না। তিনি অবশেষে কালো রাণীকে ডাকিয়া শাস্তির কথা জিজ্ঞাসা করিলে কালোরাণী বলিল: 'আহা হা! এমন সোনার কমলের ও যে অনিষ্ট করতে পারে, তাকে জীয়ন্ত পুড়িয়ে ফেলা উচিত। আর সেই ছাই আস্তাকুড়ে ফেলে দিলে তবে সে হতভাগার উপযুক্ত শাস্তি হয়।

একে একে কালোরাণীর ছলনার কথা বলিল

রাজা বলিলেন, 'তুমি নিজ মুখেই তোমার নিজের শাস্তির বিষয় প্রকাশ করেছ। বেশ ভাল হলো। রাজার আদেশে তৎক্ষণাৎ কালো-রাণীকে বাঁধিয়া ফেলিয়া রাজভৃত্যগণ তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল এবং সেই পোড়ান ছাই আস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিল।

তারপর কি হইল শুনিতে চাও? রাজা আর সেই পরীরাণী সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

গাধার বুদ্ধি

আরব দেশে বোগদাদ নগর। বোগদাদ নগরের আলী ইমামখাঁ সদাগর তাঁহার একমাত্র ছেলে রাজেব খাঁর জন্য প্রচুর ধন সম্পত্তি রাখিয়া মারা যান, রাজেব খাঁ যদি বাপের মত ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে মন দিত তাহা হইলে সেও যে তাহার বাপের ন্যায় সহরের মধ্যে একজন বড় সদাগর বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারিত তাহাতে কোন সন্দেহই ছিলনা, কিন্তু সেদিকে তাহার লক্ষ্য না গিয়া লক্ষ্য পড়িল একটি সুন্দরী কুমারীর প্রতি। রাজেব সেই মেয়েটিকে বিবাহ করিবার জন্য একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। ঘটনাটাও একটু বিচিত্র রকমের,—একদিন বিকেল বেলা নমাজ পড়িতে মস্‌জিদে যাইবার সময় সে ঐ মেয়েটিকে দেখিতে পায়, মেয়েটি তখন মুখের ঘোমটা সরাইয়া মস্‌জিদের শীতল জলের ফোয়ারা হইতে জল পান করিতেছিল। রাজেব প্রথমবার মেয়েটিকে দেখিয়াই এত মুগ্ধ হইল যে সেই মেয়েটি যে পথ ধরিয়া বাড়ী যাইতেছিল সেও সেই পথ ধরিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল এবং দূর হইতে তাহার বাসস্থান দেখিয়া লইল এবং পাড়াপড়শীর নিকট হইতে সন্ধান লইয়া জানিল মেয়েটি দেখিতেও যেমন সুন্দরী তার স্বভাব চরিত্রও তেমনি ভাল।

পরদিন ভোরের বেলা রাজেব দিব্য সাজগোজ করিয়া ঐ বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। মেয়েটির বাপ তখন চোখে চশমা লাগাইয়া দিব্য আরামে বসিয়া কোরাণসরিফ পাঠ করিতেছিলেন। তাহার সহিত দু' চারিটি শিষ্টাচারসম্মত কথাবার্ত্তার পরেই রাজেব সাহস করিয়া একেবারে বিবাহের কথাটা পাড়িয়া বসিল।

আলী ইমাম সদাগর খুব টাকা-কড়ি রাখিয়া মারা গিয়াছেন এ-সংবাদটা বোগ্‌দাদের সকলেই জানিত, মেয়ের বাপেরও ইহা অজানা ছিল না, সে এই সুযোগে একটু গুছাইয়া লইবার মতলবে নাক হইতে চশমাটা নামাইয়া রাজেবের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিয়া বলিল: দেখ বাপু! তুমি হচ্ছ আমাদের পাল্‌টে ঘর, তোমার সঙ্গে

আমার মেয়ের বিয়ে দিতে কোন বাধা নেই, তবে কি জান বাবা! গেল বছর ব্যবসাটা বড় মন্দা গেছে, কিছু ধার-কর্জও হয়েছে, তাই বল্‌ছিলুম যদি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাও তবে নগদ দশটী হাজার টাকা দিতে হবে। যদি পার বিয়ে হবে, নইলে নয়। আমার এই এক কথা।

মেয়েটি ঘোমটা সরাইয়া ফোয়ারার জল পান করিতেছিল

রাজেব অনেক মিনতি করিয়াও যখন মেয়ের বাপের এই কঠিন পণ কোন মতেই দূর করিতে পারিল না তখন ধীরে ধীরে বলিল: দেখুন, দু'চার দিনের মধ্যে এতগুলো টাকা সংগ্রহ করা বড় সোজা নয়, আমাকে যদি অন্ততঃ এক বছরের সময় দেন তাহলে চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারি। আমার এই অনুরোধ যে এক বছর না দেখে আপনার মেয়ের কোথাও বিয়ে দেবেন না। শুধু এইটুকু দয়া আমায় কর্‌তেই হ'বে। মেয়ের বাপ রাজেবের এ-কথায় সম্মত হইয়া বলিলেন: দেখ আমি তোমার কথায় এই বলে স্বীকার হচ্চি যে, যদি এক বছরের মধ্যে তুমি টাকা দিতে না পার তাহলে আমার মেয়ের অন্য যায়গায় বিয়ে দিব। রাজেব সম্মত হইয়া সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

বাড়ী ফিরিয়া রাজেবের মনে বড়ই কষ্ট হইল। সে বসিয়া বসিয়া খানিকক্ষণ কাঁদিল। কেন সে কুঁড়ের মত দিন কাটাইয়াছে? যদি সে তার বাপের মত ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিত তাহ'লে কি তার আজ এমন বিপদে পড়িতে হয়? দশ হাজারত দশ হাজার! আজ লাখো লাখো টাকাও সিন্দুক থেকে বাহির করিয়া দিতে পারিত। সে বাক্স খুলিয়া নগদ টাকা-কড়ি যাহা কিছু ছিল বাহির করিল। একবার দুই-বার তিনবার একটী একটী করিয়া গুণিয়া দেখিল। ওকি! এ যে তিন হাজার টাকার একটীও বেশী নয়! এখন উপায়? সে কেমন করিয়া মাত্র এক বছর সময়ের মধ্যে দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিবে! ভগ্ন-প্রাণে রাজেব খাঁ একেবারে শয্যা লইল।

সারারাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া খুব ভোরে সে শয্যা ছাড়িল। হাতমুখ ধুইয়া ঘরের এককোণে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাহার মনে পড়িল যে মক্কাসহরে তাহার এক মামা আছেন, তিনি খুব ধনী। এ-সময়ে তাঁহার কাছে অর্থ সাহায্য পাওয়া সম্ভব বটে, কারণ তাহার সে মামার সংসারে রাজেব ছাড়া আর কেহই নাই। বুড়ো একাকীই সংসারের সুখ-দুঃখ সহিয়া আসিতেছেন, এসময়ে রাজেব খাঁ তাহার নিকট করুণা প্রার্থী হইলেও কি বৃদ্ধের হৃদয় গলিবে না? মানুষ আশার দাস। রাজেবও আশার উপর নির্ভর করিয়া সে দিনই মক্কাসরিফের দিকে রওয়ানা হইল।

ধূধূ করে মরুভূমি। চারিদিকে বসতি নাই, আশ্রয় নাই, একবিন্দু জল পাইবার ভরসা নাই। রাজেব এ-সকলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া,

নানাকষ্ট সহিয়া, দুইদিন পরে আসিয়া মক্কা পৌঁছিল। এতটা পথ সে উটের পিঠে না চড়িয়া হাঁটিয়াই আসিয়াছিল।

মক্কা খুব বড় সহর। বড় বড় বাড়ী ঘর। সুন্দর সুন্দর পাথরে বাঁধান রাস্তা। মস্‌জিদে—মিণারে-তোরণে-বাগানে নগরটি শোভা পাই-তেছে। রাজেব যখন মক্কা পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। একটা বড় বাড়ীর পাশে কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে খেলা করিতেছিল, রাজেব তাহাদের একজনের কাছে তার মামার বাড়ীর খোঁজ লইতে চেষ্টা করিল, সে ভাবিয়াছিল তার মামা যখন সহরের মধ্যে একজন খুব বড়লোক তখন মক্কা সহরের সকলেই হয়ত তার খবর রাখে। তাই সে আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল— ওহে ছেলেরা সব, বল্‌তে পার এ-সহরের খুব বড় ধনী হোসেনখাঁর বাড়ী কোথায়? ছেলেরা তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—তুমি বুঝি এ-সহরে নূতন এসেছ? তাই জাননা! আরে হোসেন খাঁ আবার বড়লোক! ওঁর মত কৃপণ কি আর এসহরে দু'টী আছে? বুড়ো খাঁ সাহেব এক পয়সার রুটি কিনে দশদিন খায়। ছেলেদের মুখে মামার কৃপণতার কথা শুনিয়া, রাজেবের হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তবু এতদূর কষ্ট করিয়া আসিয়া মামার সঙ্গে দেখা করিয়া না যাওয়া রাজেবের ভাল বোধ হইল না তাই সে ঐদলের একটী ছেলেকে মামার বাড়ীর পথ দেখাইবার জন্য সঙ্গে লইল। দূর হইতে একটী ছোট বাড়ী দেখাইয়া বালকটী আবার খেলিতে চলিয়া গেল।

ছোট একটী দালান। এখানে সেখানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। চারিদিক বেড়িয়া একটী ছোট প্রাচীর, প্রাচীরের গায়ে আগাছা জন্মিয়াছে। উঠানের এক পাশে একটী বাদাম গাছ। প্রাঙ্গণের ভিতরে নানাবিধ আবর্জ্জনা। সহসা দেখিলে মনে হয় এটা একটা পোড়োবাড়ী। রাজেব প্রাঙ্গণের ভিতরে ঢুকিয়া দেখিতে পাইল একটী বৃদ্ধ দালানের রোয়াকে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার পাকা লম্বা দাড়ি নাভি পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে, মাথায় মস্ত একটী টাক্। গায়ে হাত কাটা একটী খুব ময়লা জামা। পরিধানে হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত খুব নোংড়া কাপড়। জীবিত মানুষের যে এমন চেহারা হইতে পারে রাজেব তাহা স্বপ্নে ও ভাবিতে পারে নাই।

সন্ধ্যার সময় হঠাৎ একজন অজানা লোককে দেখিতে পাইয়া বৃদ্ধ একটু কর্কশ স্বরে বলিল: তুমি কে? কি চাও?

রাজেব উচ্চৈঃস্বরে বলিল: মামা, ও-মামা! তুমি আমায় চিন্‌তে পাচ্চ না? আমি রাজেবখাঁ, তোমার ছোট বোনের ছেলে। বোগ্দাদের আলীইমাম খাঁ সদাগর আমার বাপ। ছেলেবেলায় তুমি আমায় কত ভালবাস্‌তে, কত আদর করতে, আমি তোমায় দেখ্‌তে এসেছি, -কেমন আছ মামা?

কি বল্‌বো ভালই আছি। উত্তর করিলেন খাঁ সাহেব।

বাবা! তবে কিনা বড় গরীব হয়ে পড়েছি, তোমাকে যে আদর-যত্ন করে দু'সন্ধ্যা খাওয়াব সে শক্তি ও নেই।

রাজেব মুখে একটু হাসি ফুটাইয়া বলিল: সেজন্য দুঃখ কি মামা! আমি ত আর তোমার পর নই? সুখ-দুঃখ সকলই খোদার মর্‌জি।

এইরূপ নানা কথাবার্ত্তা হইতে হইতে উভয়ে বাড়ীর মধ্যে হোসেনখাঁর শোবার ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরটি খুব ছোট। আর অমাবস্যার অন্ধকারের মত ভিতরটা অন্ধকার, এক দরোজা ছাড়া অন্য একটী জানালাও নাই। বৃদ্ধ ঘরে গিয়া চক্‌মকি ঠুকিয়া একটা প্রদীপ জ্বালিল। রাজেব প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে দেখিতে পাইল—ঘরের মাঝে সাজ-সরঞ্জাম কিছুই নাই, শুধু একটী ছোট মাদুরপাতা, একটী ভাঙ্গা কুঁজো আর জল খাবার একটী গ্লাস। রাজেব কে ঘরে বসাইয়া রাখিয়া হোসেনখাঁ বাজার করিতে গেল। মক্কার লোকে হোসেনখাঁকে কোন দিন এত বেশী পয়সা খরচ করিতে দেখে নাই, ভাগিনেয় আসিয়াছে, তাই বৃদ্ধ দুই পয়সা ভাঙ্গিয়া রুটি, মাখন, চিনি, দুধ লইয়া ঘরে ফিরিল। দুইজনে মিলিয়া সেই রুটি, মাখন খাইয়া রাত্রি শেষ করিল।

রাজেব চিরদিন সুখের কোলে লালিত-পালিত হইয়া আসিয়াছে—কোন দিন দুঃখ বলিয়া কিছু জানে না, এমন কদর্য্য খাওয়া সে কোন দিন খায় নাই। দু'দিনের এত যাতায়াতের কষ্টের পর এ-সামান্য খাদ্য খাইয়া তাহার বড়ই কষ্ট হইল, কিন্তু কি করা? সকলই অদৃষ্ট। খাওয়া দাওয়ার পর একথা সে কথা তুলিয়া নানা গল্পের শেষে সে তাহার মনের ভাব মামার

নিকট প্রকাশ করিল। বৃদ্ধ হোসেনখাঁ ইঙ্গিতেই রাজেবের মনের ভাব বুঝিয়া বলিল: দেখ, বাবা আমি বড় গরীব, দুনিয়ায় আমার মত দুঃখী আর নেই, আমার দু'টী মাত্র পয়সা সম্বল ছিল তাও আজ তোমায় খাওয়াতেই খরচ করে ফেলেছি, ফকির দরবেশও আমার মত গরীব নয়। রাজেব মাতুলের এইরূপ উক্তিতেও বিচলিত না হইয়া নানারূপে তাহার মন নরম করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী' কিছুতেই সে বৃদ্ধ কৃপণের মন গলাইতে পারিল না।

রাজেব মনের দুঃখ গোপন করিবার জন্য এবং বাহিরের শীতল বাতাসে ক্লান্ত দেহ ও মন সুস্থ হইবে ভাবিয়া ঘরের বাহিরে আসিল। তখন বাহিরে জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। নির্ম্মল আকাশে তারা-চন্দ্র হাসিতেছে। রাজেব বাহিরে আসিয়া দেখিল ঘরের এক কোণে প্রাঙ্গণের এক পাশে একটী জীর্ণ শীর্ণ দেহ রোগা গাধা কতকটা শুক্‌নো বিচালি খাইতেছে। রাজেব পশু-পক্ষী খুব ভালবাসিত, তাই গাধাটার কাছে বসিয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া উহার খাবার আনিতে বাজারে গেল—এবং খুব বড় একটা ঘাসের বোঝা আনিয়া গাধাটাকে খাইতে দিল। গাধাটাকে ঘাস-জল দিয়া সে তাহার মামার পাশে সেই ছেঁড়া মাদুরে শুইয়া রাত কাটাইয়া দিল।

পরদিন ভোরের বেলা বুড়োকে আবার মনের দুঃখ জানাইল কিন্তু সেই এক কথা, আমি বাপু বড় গরিব, দু'টী খাবারই জোটে না, তোমাকে এত টাকা কোথা থেকে দিই। রাজেব আর কি করিবে? বসিয়া থাকিয়া সময় নষ্ট করিলে কি আর তার চলে? মামার নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইলে হোসেনখাঁ আঙ্গুল দিয়া উঠানের মাঝখানে বাঁধা গাধাটাকে দেখাইয়া বলিল: দেখ বাপু এই গাধাটাই আমার এক মাত্র সম্পত্তি—আমি এটাকে আজ বাজারে নিয়ে বিক্রী কর্‌বো, তুমিও আমার সাথে এসে একবার দেখই না এটার দর কত হয়। রাজেব বৃদ্ধের কথায় সম্মত হইল। মামা ভাগিনেয় দু'জনে গাধাটাকে লইয়া বাজারের দিকে গেল। রাজেব গাধার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে ধীরে ধীরে তাহাকে লইয়া চলিল,—গাধাটা মাঝে মাঝে মাথাটা তুলিয়া রাজেবের দিকে এমন ভাবে চাহিতে

লাগিল এবং মেজেতে পা দিয়া এম্‌নি দু'চারবার তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য ঠক্‌ঠক্‌ করিতে লাগিল যে—সে যেন বলিতেছিল: ওগো তুমিই আমায় কেন না?

সারাপথে রাজেব ভাবিতেছিল, গাধাটা কেন এরূপ করিতেছে? আমি কি গাধাটাকে কিনিব? শেষটায় সে ঠিক্‌ করিয়া বসিল গাধাটাকে কিনিতেই হইবে। ক্রমে তাহারা বাজারে গিয়া পৌঁছিল। একজন দু'জন করিয়া গাধাটার বহু ক্রেতাও আসিয়া জুটিতে লাগিল। কেহ বলিল, দু'শো, কেহ বলিল তিনশো, কেহ বলিল পাঁচশো, পাঁচশোর উপরে আর দাম উঠিল না। রাজেব বুঝিল যে তাহার মামা পাঁচশো টাকায়ই গাধাটাকে বিক্রী করিবে তখন সে হোসেন খাঁকে বলিল: 'মামা, এ গাধাটাকে আমিই কিন্‌বো।'

তা বেশ বাপু, কিন্তু এর দামটা কত দিতে পার্‌বে বল। সে যা' হক, আমিই এটা কিন্‌বো। মাতুল মহাশয় ছোট ছোট চোখ দু'টি একটু বড় করিয়া কহিল-- কিন্‌বে বেশ, আমার কোন বাধা নেই, কিন্তু বাবা, এক হাজার টাকার একটী কড়ি কমেও হবে না। রাজেবের এই গাধাটিকে কিনিবার এতই জেদ বাড়িয়া গিয়াছিল যে সে আর কোন আপত্তি না করিয়া মামার কথায়ই স্বীকার হইল।

রাজেবের টাকা-কড়ি সবই বোগ্দাদে ছিল—সঙ্গে পথ খরচ বাবদ অতি সামান্য টাকাই সে আনিয়াছিল। গাধার মূল্য বাবদ হোসেন খাঁর প্রাপ্য টাকা বোগ্দাদ যাইয়া দিবে একথা বলিয়া সে তাহাকে ও বোগ্দাদ যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। বৃদ্ধ হোসেন বিনা ওজরে সম্মত হইয়া রাজেবের সহিত বোগ্দাদ আসিল এবং টাকা পাইয়া পুনরায় মক্কার পথে অগ্রসর হইল।

রাজেব গাধাটাকে খুব যত্ন করিতে লাগিল, তার থাকিবার এবং প্রচুর খাবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ায় অল্প দিনের মধ্যেই উহার শ্রী ফিরিয়া গেল! এদিকে হোসেন খাঁকে মক্কা আসিবার পথে এক দল ডাকাত আক্রমণ করিয়া খুন করিল এবং যাহা কিছু ছিল সব লইয়া পলাইল। এ-সংবাদটা রাজেবের কানেও আসিয়া পৌঁছিল। মামার এইরূপ মৃত্যু-সংবাদে রাজেব না কাঁদিয়া থাকিতে পারিল না। হায়! হায়! বুড়ো বেচারার টাকা টাকা করিয়াই প্রাণটা গেল।

হোসেনখাঁর রাজেব ব্যতীত আর কেহ মালিক ছিল না, কাজেই

নানাদিক বিবেচনা করিয়া সে পুনরায় গাধার পিঠে চড়িয়া মক্কা রওনা হইল। মক্কায় মামার বাড়ী পৌঁছিয়া গাধাটাকে আস্তাবলের পাশে রাখিয়া সে ঘরের এ-দিক ওদিক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও কিছু পাইল না।

রাজেব যখন চারিদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল তখন গাধাটা আস্তাবলের মধ্য হইতে ঘন ঘন চেঁচাইতেছিল। এতটা পথ চলিয়া আসায় গাধাটার খুব ক্ষুধা লাগিয়াছে ভাবিয়া সে তাড়াতাড়ি উহার কাছে কতকগুলি ঘাস ও জল আনিয়া দিল। কিন্তু গাধাটী তাহা স্পর্শ ও করিল না, সে শুধু আস্তাবলের মেজের মাঝখানটায় সামনের দুটো পা দিয়া খটাখট্ শব্দ করিতেছিল ও রাজেবের মুখের দিকে চাহিতেছিল। রাজেব তাহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া মনে

লোহার শাবল দিয়া......খুড়িতে লাগিল

মনে ভাবিল তাইত গাধাটা এমন করে কেন? আচ্ছা দেখা যাক্‌না এই বলিয়া সে কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া একটা লোহার শাবল দিয়া গাধাটা যে যায়গায় পা দিয়া আঘাত করিতেছিল আস্তাবলের সেখানটা খুঁড়িতে লাগিল। খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটী দু'টী করিয়া ক্রমানবয়ে গাধার চিহ্নিত মত নানাস্থান হইতে দশটি সিন্দুক বাহির করিল। প্রত্যেকটি সিন্দুক, হীরা, মণি, চুণি, মতি, টাকা, মোহর, জহরত, রূপায় ভরা। রাজেবের আর আনন্দের অবধি রহিল না, সে গাধাটাকে নানারূপ আদর করিতে লাগিল।

তারপর দিন এসমুদয় ধন-রত্ন সতর্ক মত গাধার পিঠে চাপাইয়া রাজেব ধীরে ধীরে বোগ্দাদে গিয়া পেঁাছিল। কোনরূপ রাত্রি কাটাইয়া পরদিন ভোরের বেলা খুব সাজ পোষাক করিয়া জাঁক-জমকের সহিত সেই কুমারীর পিতার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। রাজেবের বিলম্ব দেখিয়া কন্যার পিতা ইতিমধ্যে একজন ধনবান বৃদ্ধ মুসলমান বণিকের সহিত মেয়ের বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন, এখন রাজেবের নিকট হইতে এক সঙ্গে প্রার্থিত মত দশ হাজার টাকা পাইয়া বিনা ওজরে আগের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া রাজেবখাঁর সহিত মেয়ের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন।

যথাসময়ে রাজেবের সহিত সেই সুন্দরী কুমারীর খুব সমা-রোহের সহিত বিবাহ হইয়া গেল। গরীব-দুঃখী-কাঙ্গাল শত শত লোক পেট ভরিয়া খাইল এবং নব দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিল। বোগ্দাদ নগরে শীঘ্র এমন ধুমধামের সহিত কোন বিবাহ হয় নাই একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছিল। রাজেব গাধাটার প্রতি বন্ধুর মত ব্যবহার করিত, তার আর যত্নের অবধি ছিল না। যে গাধার বুদ্ধি বলে সে এত ধন-রত্ন লাভ করিয়া এবং মনের মত সুন্দরী স্ত্রী পাইয়া সুখে সংসার করিতে পারিল সেই প্রিয়তম গাধার উপর সে শুধু একটী ভার দিয়াছিল—মাঝে মাঝে তাহার স্ত্রীকে ও ছোট ছেলেকে পিঠে করিয়া তাহার সহর ঘুরিতে হইত। বোগ্দাদের সকলেই এই গাধাটীকে ভালবাসিত।

তিন রাজপুত্রের কথা

সেকালে এক রাজা ছিলেন, তাঁর ছিল তিন মেয়ে। মেয়ে তিনটী পরমাসুন্দরী, রূপে গুণে অতুলনা। এই তিন রাজ-কন্যার সঙ্গে আর এক দেশের তিন রাজপুত্রের বিবাহের সব ঠিক্‌ঠাক। দৈবের ঘটনা। এক দুষ্ট যাদুকর সে তিন রাজপুত্রকে যাদুবিদ্যা বলে হরিণ, ঈগল পাখী ও হাঙ্গরে পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। কাজে কাজেই এ-তিন রাজপুত্রের সঙ্গে আর সেই তিন রাজ কন্যার বিবাহ দিতে রাজা স্বীকার হইলেন না।

ঐ তিন রাজপুত্র পশু, পক্ষী ও জলজন্তু হইলেও তাহাদের মানুষের ন্যায় জ্ঞান-বুদ্ধি সকলই আগের মত ঠিক ছিল। তাহাদের সঙ্গে যে রাজকুমারীগণের বিবাহের কথা-বার্ত্তা ঠিক্ হইয়াছিল তাহাদের কিনা আবার অন্য লোকের সঙ্গে বিবাহ হইবে? অসহ্য! বড় রাজপুত্র হইয়াছিলেন ঈগল পাখী। ঈগল—পাখীর রাজা। তাহার ডাকে কাক, চিল, বাজ, ময়ূর, টিয়া, ময়না, চাতক, চড়ুই কতইবা আর নাম করিব! সব পাখী মিলিত হইয়া সে দেশের রাজার রাজ্যে যত গাছ-পালা ছিল তার একটী ফুল পাতাও থাকিতে দিল না। রাজ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল! দ্বিতীয় হরিণ রূপী রাজপুত্র রাজাকে জব্দ করিবার জন্য বনের যত পশুর দল ডাকিয়া আনিল। ছাগল, খরগোস প্রভৃতি নিরীহ পশু হইতে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ইত্যাদি নানা বন্য-পশু রাজ্যের বন-জঙ্গল-মাঠ ছাইয়া ফেলিল, সব ফসল ধবংস করিল—মানুষ ধরিয়া খাইল। কি সর্ব্বনাশ! রাজ্য যুড়িয়া দীন-দুঃখী প্রজার ক্রন্দনের রোল উঠিল।

তৃতীয় রাজপুত্র হইয়াছিলেন হাঙ্গর। হাঙ্গর সমুদ্রের সকল জল-জন্তুকে জড় করিয়া তাহাদের সাহায্যে সমুদ্রের জল তোলপাড় করিতে শুরু করিয়া দিল। রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হইতে চলিল, কারণ বাণিজ্য জাহাজ আর সাগর পার হইতে পারে না। তরঙ্গের আঘাতে কিছুদূর যাইতে না যাইতেই ডুবিয়া যায়। রাজ্য অচল।

ব্যবসা নাই—বাণিজ্য নাই—ঘরে অন্ন নাই—প্রজার মুখে শুধু এক কথা: দোহাই রাজা রক্ষা করুন।

রাজা প্রমাদ গণিলেন। এ-বিপদের হাত হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় হরিণ, ঈগল ও হাঙ্গরের সহিত তিন কন্যার বিবাহ দেওয়া। রাজা প্রজার কল্যাণের দিকে চাহিয়া অবশেষে তিন রাজকন্যার সহিত ঐ তিন রাজপুত্রের বিবাহ দিলেন।

ঈগল, হরিণ ও হাঙ্গররূপী তিন রাজপুত্র যখন তিন রাজ-কুমারীকে নিজ নিজ রাজ্যে লইয়া যাইতে আসিল, তখন রাণীমা তিন কন্যার আঙ্গুলে তিনটী অঙ্গুরী পরাইয়া বলিলেন: বাছারা, তোমরা এ অঙ্গুরী তিনটী যত্ন করে রেখে দিও। যদি কোন দিন তোমাদের কোন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা হয় তাহা হইলে এই অঙ্গুরী দেখালেই তারা চিন্‌তে পার্‌বে। খুব সাবধান করে নিজেদের কাছে এ অঙ্গুরী তিনটী রেখো।

তারপর তিন রাজপুত্র তিন রাজকন্যাকে লইয়া তিন দিকে রওয়ানা হইল। ঈগল পাখী বড় রাজকুমারীকে লইয়া এক উঁচু পাহাড়ের উপর যে সোণার বাড়ী সে বাড়ীতে লইয়া গেল। সে বাড়ী মেঘরাজ্যের উপর অবস্থিত। সেখানে কোন দিন বৃষ্টি হয় না। সূর্য্যদেব দিবারাত্র সমানভাবে উজ্জ্বল আলো দেন। রাজকন্যা মেঘ-রাজ্যের রাণী হইয়া মনের সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

হরিণরূপী দ্বিতীয় রাজপুত্র, দ্বিতীয় রাজকন্যাকে লইয়া খুব গভীর বনের মধ্যে গেলেন। সেথায় এক সুন্দর ফুলে ফলে ভরা বাগান বাড়ীর মধ্যে রাখিয়া তাহাকে বনের রাণী করিয়া আনন্দে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় হাঙ্গররূপী রাজপুত্র ছোট রাজকন্যাকে সহ সমুদ্রের গভীর জলের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সেখানে পাতালপুরীর খুব এক উঁচু পাহাড়ের উপর প্রবাল, মণি, মুক্তায় গড়া এক সুন্দর বাড়ীতে রাজকন্যাকে সহ বাস করিতে লাগিল।

কয়েক বৎসর পরে সে দেশের রাণীর একটী অতি সুন্দর পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। রাজকুমার ক্রমে ক্রমে বড় হইতে লাগিল। রাজা-রাণী আদর করিয়া ছেলের নাম রাখিলেন—সন্তোষকুমার।

সন্তোষকুমার যেমন দেখিতে চাঁদের মত মনোহর, বিদ্যা-বুদ্ধি জ্ঞানেও তেম্নি অল্প বয়সের মধ্যে সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়া উঠিল। রাজপুত্রের নিকট রাণীমা তাঁহার সেই তিন কন্যা ও তিন জামাতার কথা বলিতেন, এক্ষণে রাজকুমার তার সেই তিন বোনের খোঁজে বাহির হইবার জন্য রাজা-রাণীর অনুমতি চাহিল। প্রথমে রাজা-রাণী তাঁদের এই একছেলেকে এমনভাবে নানা অজানা দেশে পাঠাইতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কিন্তু পরে ছেলের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন।

সন্তোষকুমার ভগ্নীদের সন্ধানে বাহির হইয়া নানাদেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন—কিন্তু কোন ভগ্নীরই কোন সন্ধান করিতে পারিলেন না। অবশেষে এক দিন বেড়াইতে বেড়াইতে এক অতি উচ্চ পাহাড়ের উপর আরোহণ করিতে করিতে সে একটী উচ্চ শৃঙ্গের উপর খুব বড় একটী বাড়ী দেখিতে পাইল। সে বাড়ীর স্তম্ভগুলি মর্ম্মর প্রস্তরে গড়া,—ছাত সোণার,—প্রাচীর প্রবালের,—আর জানালাগুলি হীরক-খচিত। সোণার ছাতে, সোণার মত সূর্য্যের আলো পড়ায় চারিদিক ঝল্‌মল্ করিতেছে।

রাজপুত্র দূর হইতে এই বাড়ীর সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলেন। এবাড়ী—ঈগলরূপী রাজপুত্রের। রাজকুমারী প্রাসাদের বারান্দায় দাঁড়াইয়া রাজপুত্রকে দেখিতেছিলেন। এই অচেনা-অজানা পাহাড়ের দেশে মেঘ-রাজ্যের উপর কে এই মানুষটি আসিল? তাহার ইহা জানিবার জন্য বিশেষ কৌতূহল হইল। রাজকুমারী রাজপুত্রকে তাঁহার নিকটে যাইতে ডাকিলেন। রাজপুত্র রাজকন্যার আদেশে প্রাসাদ-কক্ষে গমন করিলে রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিল তাহার পরিচয়: সে কে? এবং কোথা হইতে আসিয়াছে ইত্যাদি বিষয় সবিস্তারে জিজ্ঞাসা করিলে রাজপুত্রও একে একে তাহার পিতা-মাতার পরিচয়, রাজ্যের ও রাজধানীর নাম সব কথা বিস্তারিতরূপে রাজকন্যার নিকট বর্ণনা করিলেন। সন্তোষ-কুমারের পরিচয় পাইয়া রাজকুমারীর আনন্দের আর অবধি রহিল না। তিনি কনিষ্ঠ সহোদরকে আদরের সহিত আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহার স্বামীর নিকট ভ্রাতাকে উপস্থিত করা অসঙ্গত মনে করিয়া রাজপুত্রকে অপর একটী কক্ষে লুকাইয়া রাখিলেন।

সন্ধ্যার সময়ে ঈগলরূপী রাজপুত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আহারাদির পরে একথা সেকথার পর রাজকুমারী স্বামীকে বলিলেন—অনেক দিন হ'ল এখানে এসেছি, বাবাকে ও মাকে দেখ্‌বার জন্যে প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে। তুমি আমার এ বাসনাটি পূর্ণ কর। ঈগল বলিল: 'দেখ, তোমার এ ইচ্ছা স্বাভাবিক, কিন্তু কি কর্‌বো বল, আবার আমি ফিরে মানুষ না হ'লে তোমার মনোবাঞ্ছা মিটাতে পাচ্ছিনে।'

আমি যখন সেখানে যেতে পারবোনা, তখন আর কাকেও নিমন্ত্রণ করে পাঠালে হয় না?'

'বেশত! কিন্তু আমার মনে হয় না যে এত দূর পথ পার হ'য়ে কেউ তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আস্‌বে।

মনে কর, যদি এখানে কেউ এসে থাকে তবে কি তুমি তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে কোন বাধা দেবে?'

ঈগল বলিল—কখনই না।

ঈগলের একথা বলার পরেই রাজকুমারী অপর কক্ষ হইতে সন্তোষকুমারকে লইয়া আসিল এবং তাহার স্বামীর সহিত পরিচয় করিয়া দিল। ঈগল পাখী শ্যালককে খুব সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া বলিল—তুমি তোমার বোনের সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য যে এতটা কষ্ট স্বীকার করে এসেছ সে জন্য খুব ধন্যবাদ দিচ্ছি। তোমার এখানে যতদিন ইচ্ছা নিজবাড়ীর মত মনে করে থেকো, যখন যে জিনিষের দরকার হ'বে আমায় জানিও। আমার চাকর বাকরকে এখুনি তোমার কথা বলে দিচ্ছি তারা তোমায় আমার মত মান্য করে চল্‌বে।

রাজপুত্র মনের সুখে এক পক্ষকাল বড় ভগ্নীর বাড়ীতে বাস করিলেন। কিন্তু তার পক্ষে এক যায়গায় বেশী দিন থাক্‌লে ত আর চলে না! আর দু' বোনের খোঁজ করাও আবশ্যক। কাজেই সন্তোষকুমার ইহাদের নিকট সব কথা খুলিয়া বলিয়া বিদায় চাহিলেন। বিদায়ের সময় ঈগল পাখী তাহার বৃহৎ পক্ষ-যুগল হইতে রাজকুমারকে একটী পালক দিয়া বলিলেন: তুমি আমার এ পালকটি নাও সাবধানে রেখো। এ-পালকটি তোমার খুব উপকারে আসবে। যখন কোন বিপদে পড়বে তখন এই পালকটি মাটিতে

ফেলে বলবে: সাহায্য কর! সাহায্য কর। অমনি আমি সেখানে উপস্থিত হ'ব এবং তোমাকে সে-বিপদ থেকে উদ্ধার করবো। রাজকুমার পালকটি খুব যত্ন করিয়া সঙ্গে লইলেন এবং ভগ্নীপতির সদয়-ব্যবহার ও উদারতার জন্য ধন্যবাদ দিয়া আবার অজানা পথে অগ্রসর হইলেন।

অনেক পরিশ্রমে আবার নানা দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া সন্তোষকুমার দ্বিতীয় ভগ্নী বনের রাণীর খোঁজ পাইলেন। সেখানেও এক পক্ষ থাকিয়া আবার তৃতীয় ভগ্নীর খোঁজে বাহির হইলেন। হরিণ রূপী ভগ্নীপতি রাজকুমারকে বিদায় দিবার সময় তাহার গায়ের একটী রোম দিয়া বলিলেন: তুমি কোন বিপদে পড়লে এই রোমটি মাটিতে ফেলে আমার সাহায্য প্রার্থনা করলে আমি অমনি তথায় গিয়ে উপস্থিত হ'ব এবং তোমার সাহায্য করবো।

এখান হইতে বিদায় হইয়া রাজপুত্র তৃতীয় ভগ্নীর উদ্দেশে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সমুদ্র-তীরে গিয়া একখানি জাহাজে চড়িয়া নানা দেশ-বিদেশ, নানা দ্বীপ-নগর-পাহাড়-পর্ব্বত ঘুরিয়া অবশেষে বহু কষ্টে এক পাহাড়ের উপরে স্বর্ণ নির্ম্মিত একবাটিতে তৃতীয় ভগ্নীর সন্ধান পাইলেন। সে-পাহাড়টী বড় সুন্দর। চারিদিকে নীল সাগরের অনন্ত লহরী-মালা। এখানেও অল্প সময়ের মধ্যেই ভাই ভগিনীতে পরিচয় হইয়া গেল। রাজপুত্র মনের সুখে সেখানে কিছুদিন কাটাইয়া পুনরায় বাপ মায়ের স্নেহের কোলে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। এবার বিদায় হইবার সময় হাঙ্গর রূপী ভগ্নীপতি তাহার শরীর হইতে একটী শল্ক উপহার দিয়া বলিল: যদি কখনও কোন বিপদে পড় তাহ'লে এই শল্কটী মাটিতে ফেলিয়া: 'আমায় সাহায্য কর! আমায় সাহায্য কর' বলিয়া চীৎকার করা মাত্র আমি তোমার সাহায্যের জন্য সেখানে যাব।' রাজপুত্র শল্কটীসহ এক জাহাজে চড়িয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলেন এবং মনের আনন্দে নিজ রাজ্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রাজকুমার অশ্বারোহণে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সম্মুখে এক বড় বন দেখিতে পাইলেন। গাছে গাছে লতায় লতায় সে বিরাট বন ঢাকা। পথ নাই—বন্য ঘাস ও কাঁটায় পথ রুদ্ধ। রাজকুমার কি

করেন? ফিরিয়া যাওয়ার—আর উপায় নাই, কাজেই সেই কাঁটাবন ও বন্যঘাসে ঢাকা পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক ক্রোশ পথ চলিলে পর একটী হ্রদের ধারে গিয়া পৌঁছিলেন। হ্রদের জল গাঢ় নীল। বাতাসের ভরে জলে ছোট ছোট ঢেউ উঠিতেছে-পড়িতেছে। চারি ধারে দেবদারু, শাল, তমাল, শিমুল ইত্যাদি নানা জাতীয় গাছের সারি। মনের আনন্দে পাখীরা গাছে গাছে বসিয়া

রাজকুমার আমায় উদ্ধার কর

সুললিত স্বরে গান করিতেছে। জলের মধ্যে হংস, সারস, বক প্রভৃতি নানা জাতীয় জলচর পাখী আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে। রাজপুত্র দেখিলেন হ্রদের পূর্ব্বতীরে একটী বিরাট প্রস্তর গঠিত দুর্গ। দুর্গের একটী কক্ষে এক সুন্দরী রাজকন্যা বসিয়া আছেন। তার পায়ের নীচে মস্ত একটা রাক্ষস, ঢাকের আওয়াজের ন্যায় ভীষণ শব্দে নাসিকা গর্জ্জন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। এ-রাক্ষসটার আবার দুইটী পাখাও আছে। রাজকুমারী দুর্গ-কক্ষ হইতে হ্রদের তীরে রাজপুত্রকে দেখিতে পাইয়া অতি করুণ-স্বরে সম্বোধন করিয়া বলিল ওগো! রাজকুমার, আমায় উদ্ধার কর। আমি এক রাজ-কন্যা এ-রাক্ষসটা আমাকে আমার পিতার রাজ্য থেকে চুরি করে এনে এই নির্জ্জন দুর্গের মধ্যে বদ্ধ করে রেখেছে। আমি এখানে বড় কষ্টে আছি। ভগবান্ দয়াময়, তিনি নিশ্চয়ই দয়া করে আমাকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য তোমাকে এখানে এনেছেন।

রাজপুত্র রাজকুমারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: রাজকুমারী তোমার দুঃখ দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্চে, কিন্তু কি কর্‌বো বল? মানুষের এমন সাধ্য নাই যে তোমায় উদ্ধার করতে পারে। এই হ্রদটা পার হয়ে এই রাক্ষসটার হাত থেকে তোমার উদ্ধার করা ত বড় সহজ নয়! আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর, দেখি আমি তোমাকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য কি কর্‌তে পারি। রাজপুত্র এইরূপ বলিয়া অমনি ভূমিতলে একে একে পাখ্‌না, রোম ও শল্ক নিক্ষেপ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 'সাহায্য চাই, সাহায্য চাই! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাহার ঐরূপ কথা বলা মাত্র ঈগল পাখী, হরিণ ও হাঙ্গর তথায় উপস্থিত হইল। সন্তোষকুমার তাহাদের এইরূপ উপস্থিতিতে বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং বন্দিনী রাজকুমারীকে দেখাইয়া তাহার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন যে আপনারা ইহাকে উদ্ধার করিয়া দিন, আমি এই রাজ-কুমারীকে বিবাহ করিয়া দেশে লইয়া যাইব। ঈগল পাখী রাজ-কুমারের কথা শুনিয়া বলিল: 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আমরা এখনই ইহাকে উদ্ধার করিয়া তোমার নিকট আনিয়া দিতেছি একথা বলিয়াই ঈগল পাখী একটা বিকট চীৎকার করিল;—চীৎকার করিবা মাত্রই নানা জাতীয় পাখীর আনন্দ ধ্বনিতে চারিদিক

প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সকল পাখী মিলিত হইয়া ঈগল পাখীর পশ্চাৎ উড়িয়া চলিল। ঈগল জানালার ভিতর দিয়া দুর্গ-কক্ষে প্রবেশ করিয়া এবং রাজকুমারীকে সহ উড়িয়া আসিয়া রাজকুমারের নিকট রাখিয়া দিল।

এদিকের নানা গোলমালে সেই বিরাট রাক্ষসের ঘুম ভাঙ্গিল। বন্দিনী রাজকুমারীকে পুনরায় ধরিবার জন্য রাক্ষসটা ঝড়ের মত প্রবল গর্জ্জনে উড়িয়া আসিতে লাগিল। রাক্ষসটা যেমন মাটিতে নামিয়াছে, অমনি হরিণরূপী রাজপুত্রের আদেশে বনের যত পশু—সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, শূকর, মহিষ, হস্তী প্রভৃতি সমুদয় বন্য জন্তু একযোগে রাক্ষসটাকে আক্রমণ করিয়া তাহার সর্ব্ব-শরীর খন্ড-বিখন্ড করিয়া ফেলিল। রাজকুমার ও রাজকুমারী এইরূপ ভাবে শত্রুকে নিহত হইতে দেখিয়া আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। হাঙ্গর বলিল—দেখ, আমারও একটা কাজ কর্‌বার আছে। যা'তে এই দুর্গের কোন চিহ্ন না থাকে আমি সে ব্যবস্থা কচ্ছি। হাঙ্গর সমুদয় জল জন্তু একত্র করিয়া হ্রদের জলে ভীষণ তরঙ্গ তুলিল। সে-তরঙ্গের ঘায় তীরের বিরাট প্রস্তর-দুর্গ ভয়ানক শব্দ করিয়া হ্রদের অতল জলে ডুবিয়া গেল। দুর্গের চিহ্ন ও আর রহিল না।

রাজকুমার আনন্দ-চিত্তে তিন ভগ্নীপতিকে ধন্যবাদ দিলেন। তখন তাহারা সমস্বরে বলিল—দেখ আমাদের যেমন তুমি ধন্যবাদ দিচ্ছ, আমরাও তেম্‌নি এ-রাজকুমারীকে ধন্যবাদ দিচ্ছি—আজ এঁকে উদ্ধার করবার ফলেই আমরা আবার মনুষ্য দেহ ফিরে পাব। আমাদের জন্ম সময়ে এক দুষ্ট ডাইনী আমাদের শাপ দেয় যে আমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে পশুর আকার প্রাপ্ত হ'ব—কিন্তু যেদিন আমরা এক বন্দিনী রাজকুমারীকে তাহার বন্ধনদশা থেকে মুক্ত করবো সেদিন আমাদের শাপ-বিমোচন হ'বে, আমরা ফিরে মনুষ্য দেহ পাব। আজ আমাদের সে-সুখের দিন উপস্থিত। কতদিন কত কাল পরে আবার মনুষ্য দেহ ফিরে পাব। আজ বড় আনন্দের দিন। একথা বলিতে বলিতে তাহারা তিনজনে পুনরায় মনুষ্য দেহ ফিরিয়া পাইল। সন্তোষকুমার—এই তিনটী তরুণ যুবকের সুন্দররূপ দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া

একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া করুণ কন্ঠে বলিলেন– হায়! বাবা মা যদি আজ এদৃশ্য দেখ্‌তে পেতেন-না জানি তাঁদের কতই আনন্দ হ'ত।

তিন রাজপুত্র বলিলেন– বেশত, চল তোমার বোনদের নিয়ে রাজা ও রাণীর নিকট যাই। যেমন কথা তেমন কাজ। পরামর্শ স্থির হইল, কিন্তু এতটা পথ তাড়াতাড়ি কি করিয়া যাওয়া যায়? তিন রাজপুত্রের আদেশে তখনি এক বৃহৎ গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল সে গাড়ীখানাকে চারিটি খুব বড় বড় সিংহ কেশর ফুলাইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে টানিয়া আনিতেছিল। সকলে মিলিয়া সেই সিংহের গাড়ীতে চড়িলেন, সারারাত্রি তীরের মত ছুটিয়া নানা যায়গা ঘুরিয়া তিন ভগ্নী, তিন ভগ্নীপতি ও দুর্গের সেই রাজকুমারী সহ সন্তোষ-কুমার মহানন্দে রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজা ও রাণীর আর আনন্দের অবধি রহিল না। তাঁহারা উভয়ে কন্যা ও জামাতার সহিত ছেলে ও ছেলের ভাবী পত্নীকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে অধীর হইলেন। অপর দেশের রাজাদেরও যথা সময়ে এসংবাদ দেওয়া হইল, তাহারাও আনন্দ-উৎসবে মত্ত হইলেন। শুভ-দিনে শুভক্ষণে বন্দিনী রাজকুমারীর সহিত রাজকুমার সন্তোষের শুভ বিবাহ হইয়া গেল। হারাণো ছেলে-মেয়েদের ফিরিয়া পাইয়া উভয় রাজ্যে আনন্দ-লহরী ছুটিল। আনন্দে বিভোর হইয়া সকলে অতীতের শোক-দুঃখ ভুলিয়া গেলেন।

দানের ফল

অযোধ্যা সিং অনেক দিন যাবত এক রাজার অধীনে সৈনিকের কাজে নিযুক্ত ছিল। স্বভাব-গুণে সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। সে যেমন আমুদে তেমনি সাহসী ও তেমনি বন্ধু-বৎসল ছিল। যে-রাজার অধীনে সে কাজ করিত সে রাজা ছিলেন খুব শান্তি-প্রিয়, অন্য কোন দেশের কোন রাজার সঙ্গে তার যুদ্ধ-বিগ্রহের আদবেই কোন সম্ভাবনা ছিল না। অনেক বৎসর কাজ করিয়া ও যখন যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইয়া খ্যাতি লাভের আশা তাহার অদৃষ্টে ঘটিল না, তখন সে মনের দুঃখে কাজ ছাড়িয়া দিয়া বহুদিন পরে আপনার ক্ষুদ্র গ্রাম খানির দিকে অগ্রসর হইল।

দূর হইতেই গ্রামখানি দেখিতে পাইয়া অযোধ্যার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সুন্দর গ্রামখানি গাছ-পালায় ঢাকা। সে কম্পিত হৃদয়ে নিজ বাড়ীতে যাইয়া পৌঁছিল। কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সে যে নারিকেল গাছগুলি রোপণ করিয়াছিল সেগুলি এখন বড় হইয়াছে। তার বাপ-মা কেহই বাঁচিয়া নাই। বাড়ীতে অপর এক গৃহস্থ আসিয়া বাস করিতেছে। বাল্যকালের বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্যে অনেকেই মৃত, যে দু'চারি জন জীবিত আছে তাহারাও বিনা পরিচয়ে বাল্যবন্ধুকে চিনিতে পারিল না। অযোধ্যা সিং বাড়ীর ধারের পুকুর পাড়ে খুব বড় একটা বটগাছের ছায়ায় বসিয়া খুব খানিকক্ষণ কাঁদিল, তারপর ধীরে ধীরে গ্রাম্য-মাতব্বর-গণের নিকট গিয়া তাহার পৈত্রিক সম্পত্তি দাবী করিল। গ্রামের বৃদ্ধ মাতব্বর তাহাকে একটী মাত্র আধুলি দিয়া বলিল—বাপু তোমার-বাবার কি কিছু ছিল? এই যা ছিল তোমায় দিলুম। সে বিনা ওজরে ঐ আধুলিটি লইয়া দেশ-ভ্রমণে বাহির হইল।

সে গ্রামের বাহির হইয়া অচেনা—অজানা পথে লক্ষ্যহীন ভাবে চলিতে চলিতে সন্ধ্যার একটু পুর্ব্বে এক বনের ধারে গিয়া পৌঁছিল। এখানে তাহার সহিত এক গরীব ভিখারীর সাক্ষাৎ হইল।

বৃদ্ধ ভিখারী অযোধ্যাকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকট নিজের দুঃখ-দৈন্য জানাইয়া ভিক্ষা চাহিল। দুঃখীর করুণ প্রার্থনায় স্বভাব—কোমল অযোধ্যার হৃদয় গলিয়া গেল, সে কোনরূপ চিন্তা না করিয়া তাহার সেই একমাত্র সম্বল আধুলিটি ভিক্ষুককে দান করিল। বৃদ্ধ ভিক্ষুক এইরূপ সদয় ব্যবহারে একান্ত মুগ্ধ হইয়া অযোধ্যাকে বলিল—বৎস! তোমার এই দয়ার ব্যবহারে বড়ই তুষ্ট হয়েছি। তুমি আমার আশীর্ব্বাদে চিরদিন মনের আনন্দে কালাতিপাত কর্‌বে। তুমি কি চাও বল, আমার বরে তোমার বাসনা পূর্ণ হ'বে।

বৃদ্ধ ভিখারীর মুখে এরকম কথা শুনিয়া অযোধ্যা একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল: প্রভু! আপনি কে তা আমি জানিনে, যদি এ-অধমের প্রতি আপনার করুণা হ'য়ে থাকে তবে আমায় এই বর দিন যেন আমি ইচ্ছা মাত্রই পৃথিবীর যে কোন জন্তুর আকার ধারণ কর্‌তে পারি।

তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'বে। মাঝে মাঝে আমার কথা স্মরণ করো। এই কথা কয়টি বলিয়া পলক মধ্যে বৃদ্ধ ভিখারী কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল—কোনরূপেই আর তাহার সন্ধান মিলিল না।

এইরূপ অলৌকিক শক্তিলাভ করিয়া অযোধ্যা সিং মনের আনন্দে পথ চলিতে আরম্ভ করিল। রাত্রিতে এক গাছ-তলায় শুইয়া কাটাইয়া পরদিন প্রত্যুষে সে এক নূতন রাজার রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিল।

সে নগরের চারিদিকে আনন্দ-কোলাহল, সৈন্যগণ রণসাজে সজ্জিত, প্রবল-নাদে আকাশ কাঁপাইয়া রণবাদ্য বাজিতেছে। রাজা স্বয়ং মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সৈন্যগণের সাজ-সজ্জা দেখিতেছেন। সকলেই যেন শত্রুর আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে। এ-রাজার সঙ্গে অন্য এক দেশের প্রবল নরপতির যুদ্ধের সম্ভাবনা হওয়ায় রাজা একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন কারণ তাঁহার তেমন সৈন্যবল নাই যে সে দেশের রাজার গতিরোধ করিতে পারেন, এজন্য রাজা স্বয়ং রণ-ক্ষেত্রে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। অযোধ্যা সিংয়ের বীর-হৃদয় সৈন্যদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও রণ-যাত্রার উৎসাহ দেখিয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সে রাজার নিকট যাইয়া সৈনিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। রাজা এই সুন্দর তরুণ

যুবকটির বীরত্ব-ব্যঞ্জক মুখ-শ্রী, বলিষ্ঠ গঠন ও নির্ভীক ভাব দেখিয়া আনন্দ-চিত্তে নিজ দেহরক্ষী সৈনিক শ্রেণীতে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। তারপর সকলে মিলিয়া রণক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইলেন।

শীঘ্র যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। উভয় পক্ষ উভয় পক্ষকে প্রবল বেগে আক্রমণ করিল। অযোধ্যা সিং যে রাজার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন সে রাজা জয়লাভ করিতে পারিলেন না। এরাজাকে এক সন্ন্যাসী অদ্ভুত এক অঙ্গুরী দান করিয়াছিলেন, অঙ্গুরিটী যখন রাজার অঙ্গুলীতে থাকিত, তখন তিনি সকলকে দেখিতে পাইতেন কিন্তু তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইত না। এমনি অদৃষ্টের ফের যে এইবার যুদ্ধে আসিবার সময় রাজা ভুল করিয়া অঙ্গুরিটী বাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। এদিকে শত্রুপক্ষ তাঁহার সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া দ্রুত গতিতে রাজার তাঁবুর দিকে আসিতেছে। রাজা প্রমাদ গণিলেন—আত্মরক্ষার জন্য অধীর হইয়া পড়িলেন। উন্মাদের মত উপস্থিত দেহরক্ষী সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন: তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কাল ভোর না হ'তে রাজধানীতে যেয়ে আমার হাতের অঙ্গুরিটি রাজকুমারীর কাছ থেকে চেয়ে আন্‌তে পার্‌বে তার সঙ্গে আমার একমাত্র কন্যা লীলাবতীর বিয়ে দিব।

সৈন্যেরা সব পরস্পরে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। কিন্তু কেহই এমন অসম-সাহসিকতার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল না। কারণ সাতদিন সাতরাত্রির কমে খুব দ্রুত ঘোড়-সোয়ারীর পক্ষেও রাজধানী হ'তে ফিরে আসা সম্ভবপর নয়। কাজেই অন্যান্য সকল সৈনিকই রাজার কথায় অস্বীকার করিল। এইবার সুযোগ বুঝিয়া অযোধ্যা সিং রাজাকে বলিল—মহারাজ! যদি আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন তাহা হ'লে আপনার নিরূপিত সময়ের মধ্যে আমি আংটিটি এনে দিতে পার্‌বো।

রাজা সম্মতি জানাইলে অযোধ্যা সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুকের কথা স্মরণ করিয়া খরগোসের আকার ধারণ করিল এবং তীরের মত বেগে ছুটিয়া চলিল। তাহার পশ্চাতে ধূলির মেঘ সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিল। নানা মাঠ জঙ্গল পার হইয়া সে এক নদীর ধারে আসিল এবং এক মৎস্যের আকার ধারণ করিয়া নদী পার হইল। নদী পার হইয়া পুনরায় একটী কবুতরের আকার

ধারণ করিয়া উড়িয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে অল্প কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই রাজধানীতে পেঁাছিয়া তৎক্ষণাৎ রাজবাটীর একটী জানালার ভিতর দিয়া উড়িয়া গিয়া একেবারে রাজকন্যার নিকট উপস্থিত হইল। রাজকন্যা এই সুন্দর সাদা ধব্‌ধবে কবুতরটিকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইল এবং তাড়াতাড়ি ঐ কবুতরটিকে কিছু দুধ খাওয়াইবার জন্য ব্যাকুল হইল। রাজকন্যা দুধ আনিবার জন্য অপর কক্ষে গিয়াছেন ইতিমধ্যে অযোধ্যা সিং মুহূর্ত্ত মধ্যে পুনরায় নিজ দেহ ধারণ করিলেন। রাজকুমারী লীলা এই আশ্চর্য্য যুবকটিকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। অযোধ্যা সিং একে একে রাজ-কন্যার নিকট সকল কথা নিবেদন করিল। রাজকুমারী বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বলিল— সৈনিক! তোমার সাহস, তোমার বীরত্ব ও তোমার মহত্ব দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। যাতে তুমি নিরাপদে আমার পিতার নিকট গিয়া আংটিটি দিতে পার সে ব্যবস্থা করো। খুব সাবধান! তোমার এখন বিপদ পদে পদে ঘট্‌বে। তোমার সুখ-সৌভাগ্যে অনেকে তোমার শত্রু হ'য়ে দাঁড়াবে।

অযোধ্যা সিং কহিল—রাজকুমারী! আপনার এ-অনুমান প্রকৃত। আমার একটি অনুরোধ যে আপনি আমার নিকট হতে কয়েকটি চিহ্ন রাখুন, যদি আমি কোনরূপ বিপদে পড়ি কিংবা আমার মরণ হয়, তা হ'লে আপনি চিহ্ন কয়টি রাজাকে দেখাবেন। আমার এ-মিনতিটি রাখুন। রাজকন্যা সম্মত হইবা মাত্রই মুহূর্ত্ত মধ্যে পুনরায় সে কপোতের আকার ধারণ করিয়া বলিল:

"রাজকুমারি! রাজকুমারি! এই মিনতি করি,
আমার ডানার দু'টী পাখা কাট তাড়াতাড়ি।"

লীলাবতী একখানা কাঁচি দিয়া তৎক্ষণাৎ কপোতের ডানা দুইটী হইতে দুইটী পালক কাটিয়া লইল। পালক দু'টী কাটার পর সে শশকের আকার ধারণ করিয়া বলিল—

"রাজকুমারি! রাজকুমারি! এই মিনতি করি,
আমার সাধের ল্যাজটি তুমি কাট তাড়াতাড়ি।"

রাজকন্যা অমনি কচ্‌ কচ্‌ করিয়া কাঁচি দিয়া ল্যাজটি কাটিয়া লইলেন। এইবার সে মৎস্যের আকার ধারণ করিয়া বলিল:

"রাজকুমারি! রাজকুমারি! এই মিনতি করি,
আমার গায়ের দু'টী শল্ক নাওগো তাড়াতাড়ি।"

রাজকুমারী তাহাই করিলেন। এইবার সে মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া অতি করুণ-স্বরে রাজকুমারীকে হৃদয়ের গভীর ভালবাসা জানাইয়া এবং তৎপরে কপোতের আকারে আংটিটি মুখে করিয়া রাজার উদ্দেশে উড়িয়া চলিল।

পাহাড়-পর্ব্বত-অরণ্য-জঙ্গল-নদী-নির্ঝর পার হইয়া রাজার শিবিরে পৌঁছিবার কিছু পূর্ব্বে কপোত আঙ্টির ভারে একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল, আর একটা ঘূর্ণীবায়ুও তাহাকে অবশ করিয়া দিল। বিশেষ ঠিক্ সময় মত পৌঁছিতে না পারিলে রাজার জীবন রক্ষা হওয়া কঠিন। কাজেই সে মাটিতে নামিয়া পুনরায় শশকের আকার ধারণ করিয়া দু'টী দাঁতের মাঝখানে আঙ্টিটি ধরিয়া তীরের মত বেগে রাজার শিবিরের দিকে ছুটিয়া চলিল।

রাজকন্যা অযোধ্যা সিংয়কে যে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন তাহা যে অলীক ভিত্তিহীন ছিল তাহা নহে। এদিকে একজন সৈনিক অযোধ্যা সিং যখন খরগোসের আকার ধারণ করিয়া আঙ্টি আনিবার জন্য রাজধানীর দিকে যায় তখন তাহা দেখিতে পাইয়াছিল। সে অবধি তাহার কাঁধে শয়তান চাপিয়া বসিয়াছিল। কতক্ষণে অযোধ্যা সিং ফিরিয়া আসিবে সে শুধু সেই সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। শিবিরের বহুদূরে ধূলির কুন্ডলী দেখিতে পাইয়া সেই দুষ্ট সৈনিক একটা ঝোপের পাশে আসিয়া বসিয়া রহিল। আঙ্গটি মুখে করিয়া শশকরূপী অযোধ্যা সিং যেমন সেই ঝোপের পাশ দিয়া দৌড়াইয়া যাইতেছিল, তখনি ঝোপের ভিতর হইতে একটা গুলি করিয়া শশকটীকে সে বধ করিয়া ফেলিল এবং তাহার মুখ হইতে আঙ্গটিটি লইয়া তাড়াতাড়ি গিয়া রাজাকে দিল। রাজার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেও তাহার ভুল হইল না।

জগদীশ্বরের অনুগ্রহে ওদিকে যুদ্ধের গতি ও ফিরিয়া গেল। একরূপ বিনা আয়াসে রাজা শত্রুপক্ষকে পরাজিত করিয়া বিপুল ধন রত্ন ও নূতন রাজত্ব লাভ করিলেন। যুদ্ধ শেষ হইল। রাজা সৈন্যগণসহ আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে করিতে রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। প্রজাগণ প্রফুল্ল-চিত্তে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল। রাজকন্যা পিতাকে সভক্তি প্রণাম করিলেন। কিন্তু একি!

তাহার উৎসুক নয়ন দু'টী যাহাকে সৈন্য দলের মধ্যে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল তাহার ত দর্শন মিলিল না। কোথায় সে! রাজা ত আর এসব কিছুই জানেন না। তিনি আনন্দ-মনে অযোধ্যা সিংয়ের হত্যাকারী সৈনিককে রাজকুমারীর নিকট উপস্থিত করিয়া বলিলেন: মা, এই বীর-পুরুষ নিজ জীবনের মায়া তুচ্ছ জ্ঞান করে আমাকে বাঁচাবার জন্য তোমার নিকট হতে আংটি চেয়ে নিয়েছিলেন। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে এইরূপ অসমসাহসিকতার কাজ কর্‌বে তার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিব। এই সেই বীর পুরুষ, ধন্য এর সাহস। কালই এসৈনিকের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিব সংকল্প করেছি। প্রজাগণ কাল থেকে আনন্দ উৎসবে মত্ত হ'বে।

রাজার মুখের কথা শেষ হইবা মাত্রই রাজকন্যা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুতেই কান্না থামিল না। আহার নাই—নিদ্রা নাই—রাজকন্যা শুধু কাঁদেন। রাজকুমারীর এ-অসুখ ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিল। বিবাহ-উৎসব থামিল।

একমাত্র মেয়ে তার এই অসুখে রাজা ভীত হইয়া পড়িলেন, তাহার মানসিক শান্তি দূর হইল। কত চিকিৎসক আসিল, কত ওঝা হাকিম তন্ত্র-মন্ত্র চলিল, কিন্তু কেহই রাজকন্যার যে কি রোগ তাহা ঠিক করিতে পারিল না।

শশকরূপী অযোধ্যা সিং মাটিতে পড়িয়া আছে। তাহার মৃতদেহের চারিদিকে কাক, চিল ইত্যাদি উড়িয়া বেড়াইতেছে। দৈবক্রমে একদিন সেই বৃদ্ধ ভিখারী সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে খরগোসের মৃতদেহ দেখিয়া বলিল: শশক উঠ, যত তাড়াতাড়ি পার দৌড়ে রাজবাড়ী যাও, তোমার বদলে আর একজন সেখানে দাঁড়িয়েছে দেরী হ'লে খুব ক্ষতি হ'বে। খরগোস গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিল এবং সেখানে পৌঁছিয়া নিজদেহ ধারণ করিল এবং রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া রাজকন্যার সহিত সত্বর তাহার বিবাহ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিল। রাজা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। একি বিচিত্র ব্যাপার! এ যে দু'জন বিবাহ প্রার্থী আসিয়া উপস্থিত। তিনি খুব রাগতস্বরে অযোধ্যা সিংকে—মিথ্যাবাদী

জুচ্চোর ইত্যাদি নানারূপ কটুবাক্য বলিয়া তাড়াইয়া দিবার জন্য প্রহরিগণকে আদেশ করিলেন।

ইহাতে অযোধ্যা সিং বড়ই মর্ম্মাহত হইল। মনের দুঃখে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে আরম্ভ করিল, কিন্তু কাঁদিয়া ত কোন ফল নাই, কাজেই রাজাকে খুব বিনীত ভাবে বলিল—মহারাজ আমি চোর কিংবা মিথ্যাবাদী নই, আমার কথা রাজকুমারী সঠিক বলতে পারবেন। রাজা অযোধ্যা সিংয়ের কথায় একটু বিচলিত হইলেন, কিন্তু মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া অযোধ্যা সিংকে রাজকন্যার কক্ষে লইয়া গেলেন। রাজকুমারী তখনও শুইয়া শুইয়া কাঁদিতেছিলেন, পদশব্দে চমকিত হইয়া অযোধ্যা সিংকে দেখিতে পাইয়া আনন্দে দাঁড়াইয়া উঠিলেন, এবং তাড়াতাড়ি বলিলেন: বাবা এই ব্যক্তিই আমার স্বামী, ইহার নিকটই আমি আপনার অঙ্গুরী দিয়েছিলাম। রাজকন্যার কথায় সকলে বিস্মিত হইলেন এবং বলিয়া উঠিলেন সে কি কথা এই ব্যক্তি তো রাজাকে অঙ্গুরী দেয় নাই; রাজকন্যা নিশ্চয়ই ভুল করেছেন।

রাজকন্যা সকলের মনের কথা বুঝিতে পারিলেন ও তাঁহার কথা যে সত্য তাহা প্রমাণ করিবার জন্য অযোধ্যা সিংয়ের দেওয়া সেই তিনটি দ্রব্য লইয়া আসিলেন। উহা রাজাকে দেখাইয়া বলিলেন: "বাবা পূর্ব্বে যে ব্যক্তি এসেছে, ঐ ব্যক্তি জোচ্চোর আপনার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে, আমি এখনই তাহার প্রমাণ করে দিচ্ছি; আপনি ঐ ব্যক্তিকে কপোত, শশক ও মৎস্যরূপ ধারণ করতে বলুন, রাজকন্যার কথা মত রাজা ঐ সৈনিককে কায়া পরিবর্ত্তন করিতে বলিলেন। দুষ্ট সৈনিকের মুখে আর কথাটি নাই; সে ভয়ে নিশ্চলভাবে সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল, মনের দুঃখে সে যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল।

অযোধ্যা সিং কাহারো কথার অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি কপোতের আকার ধারণ করিয়া রাজকন্যার কোলে গিয়া বসিয়া বলিল:

"রাজকুমারি! রাজকুমারি! এই মিনতি করি,
আমার সাধের পালক দুটি ফিরে দেওনা পরি।"

রাজকুমারী পেটারা খুলিয়া আবার সেই পালক দুটি বাহির করিয়া তাহাকে পরাইয়া দিলেন।

এই ভাবে সে পুনরায় শশক ও মৎস্যের রূপ ধারণ করিয়া সকলকে বিস্মিত করিল, এক্ষণে সকলের সন্দেহ ঘুচিল। রাজাও তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। সেই দুষ্ট সৈনিকটা তখনি ধৃত হইয়া প্রাণ-দন্ডে দন্ডিত হইল।

পরদিন রাজ্য যুড়িয়া আনন্দ ধ্বনি জাগিয়া উঠিল—হাঁক-ডাক সাজ-সজ্জা আরম্ভ হইল—শুভক্ষণে রাজকন্যা লীলাবতীর সহিত অযোধ্যা সিংয়ের বিবাহ হইয়া গেল। রাজা যে নূতন রাজ্য জয় করিয়াছিলেন তাহা কন্যা-জামাতাকে যৌতুক স্বরূপ দান করিলেন। অযোধ্যা সিং রাজা হইলেন এবং লীলাবতী রাণী হইয়া পরম সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। এতদিনে অযোধ্যা সিংয়ের দানের ফল ফলিল।

বীর রাজকুমার

এক রাজা আর রাণী। রাজারাণীর ছেলে মেয়ে কিছুই হয় না। কত যাগ-যজ্ঞ-হোম-তর্পণ করিলেন কিছুতেই কোন ফল পাইলেন না। অবশেষে এক সন্ন্যাসীর বরে রাজা রাণীর এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। সন্ন্যাসী বর দেওয়ার সময় রাজা ও রাণীকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে সপ্তদশবর্ষ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত রাজকুমারী যেন রাজবাড়ীর বাহিরে না যায়. যদি তাঁহার এ-আদেশ কোন রূপ লঙ্ঘন হয় তাহা হইলে ভয়ানক বিপদ ঘটিবে!

মেয়েটি দেখিতে অত্যন্ত সুন্দরী হইয়াছিল। তার ললাট পূর্ণ-চন্দ্রের মত উজ্জ্বল, ঠোঁট দুখানি লাল টুকটুকে ঠিক যেন গোলাপের পাপড়ি, গায়ের রং পদ্মের মত সাদা। শ্বাস প্রশ্বাসে বেলফুলের সুমধুর সুরভি, কণ্ঠে কোকিল-ধ্বনি, হাসিলে মুক্তা ঝরে, কাঁদিলে হীরা পড়ে। যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়।

রাজকন্যা রাজপুরীতে থাকেন। রাজার আদেশে চারিদিকে সতর্ক প্রহরী, কোনরূপেই যেন রাজকন্যা পুরীর বাহির হইতে না পারেন। রাজবাড়ীর বাহিরে যে বিরাট পৃথিবী পড়িয়া আছে রাজকন্যা ভ্রমেও সে-কল্পনা করিতে পারেন না, তাহার বিশ্বাস রাজবাড়ীই বুঝি পৃথিবী আর দাসদাসী লোক জন বাপ মা ইহারাই বুঝি সব। রাজকন্যার রূপের খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কত দেশ দেশান্তরের রাজা, রাজপুত্র তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠাইলেন তাহার ইয়ত্তা ছিল না। রাজাও রাণীর এই অভিপ্রায় ছিল যে রাজকুমারী সপ্তদশবর্ষ অতিক্রম করিলে তাহারা স্বয়ংবর সভা আহ্বান করিবেন সেই সভায় রাজকুমারী যাঁহাকে বরণ করিবেন রাজা তাঁহার সহিতই কন্যার বিবাহ দিবেন।

দেখিতে দেখিতে রাজকুমারীর সপ্তদশ বর্ষ পূর্ণ হইতে চলিল, সতরো বৎসর পূর্ণ হইবার ঠিক যখন একদিন বাকী তখন রাজা ও রাণী তাঁহাদের মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। রাজকুমারী এই সংবাদে

অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। সে-দিন তার এমনি আনন্দ হইল যে বাগানের চারি ধারে বেড়াইবার জন্য তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

বদ্ধ প্রাচীর পার হইয়া কিছুদূরে আসিলে পর দেখিতে পাইলেন চারিদিকে সুন্দর সবুজ গাছপালা: এখানে একটী ফুলের গাছ, ওখানে একটী ফলের গাছ দূরে অতিবড় সবুজ মাঠ, উর্দ্ধে নীল সুন্দর আকাশ। রাজকন্যা এ-দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে একেবারে পুরীর বাহিরে আসিয়া পড়িলেন! এদিকে যেমনি রাজকন্যা পুরীর বাহিরে আসিয়া পড়িলেন অমনি একটা প্রবল ঘূর্ণী বাতাস ভীষণ গর্জ্জনে কোথা হইতে আসিয়া যে রাজকন্যাকে উড়াইয়া লইয়া গেল কেহই তাহার সন্ধান পাইল না।

রাজা ও রাণী এই দুঃসংবাদে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না। সেই সময়ে একদল রাজপুত্রও রাজ কন্যার করপ্রার্থী হইয়া সেখানে উপস্থিত ছিল তাহারা রাজাকে শোক করিতে দেখিয়া তাঁহার শোকের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন: কি বলব আমার অদৃষ্ট নেহাৎ মন্দ কোথা থেকে একটা দুষ্ট ঘূর্ণী বাতাস এসে আমার মেয়েকে উড়িয়ে নিয়ে গেল তার কোনই খবর পাচ্চিনে, তোমাদের মধ্যে যে রাজপুত্র তাকে খুঁজে এনে দিতে পারবে তারি সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিব এবং অর্দ্ধেক রাজ্য যৌতুক স্বরূপ দিব। মৃত্যুর পরে সেই আমার সমগ্র রাজ্যের রাজা হবে।

রাজার মুখে এ-কথা শুনিয়া অনেক রাজপুত্রই ভীত মনে নিজ নিজ রাজ্যে চলিয়া গেলেন। কিন্তু একজন রাজপুত্র কিছুতেই গেলেন না। রাজকন্যার সন্ধানে বাহির হইলেন। এই রাজপুত্র দেখিতে যেমন সুশ্রী, সবল, সাহসিকতায়ও তেমনি অদ্বিতীয়। তার দক্ষিণ হস্ত ছিল সোণায় গড়া, চক্ষু ছিল আগুণের মত দীপ্ত এবং হৃদয় ছিল নির্ভীক। রাজপুত্র গভীর নদী উচ্চ পর্ব্বতমালা এবং নানা দেশ-দেশান্তর পার হইয়া অবশেষে এক দিবস সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে এক গভীর বনের নিকট পৌঁছিলেন।

রাজপুত্র বনের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বড়ই মুগ্ধ হইলেন।

বনের অদূরে দিয়া একটী ছোট নদী কুল কুল করিয়া বহিয়া যাইতেছে, নানা জাতীয় সুন্দর সুন্দর পাখী গাছের শাখায় বসিয়া গান গাহিতেছে, বিস্তৃত সুন্দর শ্যামল শস্য পূর্ণ মাঠ, মাঠের চারিদিকে নানা রকমের ফুল লাল নীল হলুদ কতই বা আর নাম করিব,—ফুটিয়া রহিয়াছে। সারা দিনের পরিশ্রমে রাজপুত্র বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিলেন এক্ষণে নদীর ধারে এক গাছের ছায়ায় বসিয়া সন্ধ্যার শীতল বাতাসে ক্লান্তি দূর করিয়া পুনরায় বনের পথে চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে খানিকটা দূরে একটী সুন্দর বাড়ী দেখিতে পাইলেন। এই বাড়ীটি দেখিয়া রাজপুত্রের প্রাণে শান্তি আসিল। ভাবিলেন উঃ বাঁচিলাম! আজ রাত্রের মত ত· আশ্রয় মিলিল। ধীরে ধীরে ঐ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া একটী কক্ষের মধ্যে দেখিলেন যে একজন খুব বৃদ্ধা স্ত্রীলোক এক স্থানে বসিয়া জপ করিতেছে, তার মাথা ভরা সাদা চুল ঠিক যেন শণের নুড়ী, গাল থুবড়া একটী ও দাঁত নাই দেখিতে যার-পর-নাই বিশ্রী, বুড়ীর দুই পার্শ্বে সুন্দর পোষাক পরা দুইটী সুন্দরী মেয়ে বসিয়াছিল, তাদের গায়ের গোলাপি রং এবং হাসিভরা মুখ, ঠিক যেন দু'টী ভোরের পদ্ম ফুটিয়া আছে। রাজকুমার ভক্তি ভরিয়া ঐ বুড়ীকে প্রণাম করিলে পর, বুড়ী জিজ্ঞাসা করিল: কিহে বাপু, তুমি কি চাও? কিজন্য আমার বাড়ীতে এসেছ?

রাজপুত্র একে একে ঐ বৃদ্ধার নিকট তাহার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলে বুড়ী খুব এক গাল উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল: হ্যাঁ হে বাপু! তোমার দেখছি সাহস কম নয়! সেখানে কি কেউ যেতে পারে? সে বড় ভীষণ যায়গা বাবা! সে বড় ভীষণ যায়গা! ঘূর্ণী দৈত্য যে উঁচু পাহাড়ের উপর থাকে সেখানে কেউ যেতে পারে না। তুমি যে কি করে সেথায় যাবে তাত আমি ভেবে ঠিক করতে পাচ্ছিনে।

রাজপুত্র বলিলেন: মরি আর বাঁচি সেখানে যাবই যাব। আপনি দয়া করে সেখানকার পথের কথা বলে দিন। বুড়ী বলিল—বাপু সে যে বড় ভীষণ ঠাঁই সেথায় গেলে রক্ষা নাই। ঘূর্ণী দৈত্য তোমায় যে মশা মাছির মত খেয়ে ফেলবে। অন্যের কথা কি আর বলব আমিই তার ভয়ে অস্থির, পাছে আমায় উড়িয়ে নিয়ে যায়, সেই ভয়েই

একশো বছর যাবত এ বাড়ীর ভিতর লুকিয়ে আছি। রাজপুত্র বলিলেন— আমার সে ভয় নেই, আমিত আর দেখ্‌তে তেমন সুন্দর নই, আর এই দেখ্‌তে পাচ্ছেন আমার সোণার হাতখানা, এ-হাত দিয়ে আমি যে কোন জিনিষ ভেঙ্গে ফেল্‌তে পারি।

বুড়ির দুই পাশে দুইটি সুন্দরী মেয়ে বসিয়া আছে

তা বাবা বেশ, তোমার যদি ভয় না হয় তবে আমি সাহায্য করব। তোমার বাপু একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে, ঘূর্ণী দৈত্যের বাড়ীতে সঞ্জীবন জলের ফোয়ারা আছে সে জলের এমনি গুণ যে সে জল স্পর্শ করা মাত্র লোকে যৌবন ফিরে পায়, আমার জন্য সেই সঞ্জীবন ফোয়ারার জল আনতে যেন বাপু ভুলোনা। রাজপুত্র বলিলেন: আমি যে করেই হউক আপনার জন্য সঞ্জীবন ফোয়ারার জল আনব।

তা বেশ বাপু তোমার কথায় আমি খুব খুশী হয়েছি, আমি তোমায় তিনটী জিনিষ দিচ্ছি নাও—এই একটী সুতোর গুলি, একটী টুপী, একটী জল খাবার গ্লাস। এ-তিনটী জিনিষের গুণ কি শোন। সুতোর গুলিটী মাটিতে ফেলে দিলে ওটি যেদিকে যাবে তুমি ঠিক সেই দিকে ঘোড়া চালিয়ে যেও। আর এই টুপিটী দিচ্ছি পাহাড়ের পথ বরফে ঢাকা, পথে দুরন্ত শীত, শীতের জ্বালায় কেউ বড় একটা ঘূর্ণী দৈত্যের নিকট যেতে পারে না, তুমি যখন বরফের পথে পৌঁছবে তখন এই টুপিটী মাথায় দিলে আর শীত বোধ হবে না। বরফের পাহাড় পার হলে তোমায় আগুণের পাহাড়ের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। দুদিকে খুব উঁচু পাহাড় সে পাহাড়ে দপ্ দপ্ করে শুধু আগুণ জ্বলছে তার ভিতর দিয়ে যেতে হবে। সেখানে তোমার বড়ই তৃষ্ণা পাবে। কত লোক যে ঘূর্ণী দৈত্যের দেশে যেতে তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে মারা গেছে তার সংখ্যা নেই। যখন তোমার তৃষ্ণা বোধ হবে তখন এই জলপাত্রটি মুখের সামনে ধরো, অমনি ঠান্ডা জল পাবে, সে জলে তোমার তৃষ্ণা দূর হবে, আগুণের পাহাড় পার হলেই ঘূর্ণী দৈত্যের বাড়ী দেখতে পাবে, খুব একটা বড় পাহাড়ের উপর সে বাড়ী। তার পর বাপু তার সঙ্গে লড়াই কর আর যাই কর সে হচ্ছে তোমার কথা, আমার অনুরোধ সে সঞ্জীবন ফোয়ারার জল আনতে ভুলো না।

রাজপুত্র বৃদ্ধার নিকট হইতে সুতা, টুপি এবং জলের গ্লাস লইয়া তাহার কন্যা দুটীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া রাজকন্যার উদ্ধার সাধনে রওয়ানা হইলেন; সুতার গুলি ফেলিয়া পথ দেখিতে দেখিতে দ্রুত বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিলেন।

দুই রাজার রাজ্য ছাড়িয়া তিনি যখন তৃতীয় রাজার রাজ্যের

মধ্যস্থল পৌঁছিলেন, তখন সম্মুখে একটী বিশাল উপত্যকা দেখিতে পাইলেন, উপত্যকার অপর পারে খুব উঁচু পাহাড় বিরাজিত, পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গ মেঘরাজ্য ভেদ করিয়া চাঁদ ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। রাজপুত্র—পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। একদৃষ্টে পাহাড়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এখানে সবুজ ঘাসের মাঠে ঘোড়াকে স্বাধীন ভাবে চরিতে দিয়া সূতার গুলি ফেলিয়া সেই পথ ধরিয়া ক্রমশঃ দুরারোহ প্রস্তরময় কঠিন পর্ব্বত গাত্র বাহিয়া উঠিতে আরম্ভ করিলেন। রাজপুত্র অর্দ্ধেক পথ গিয়াছেন এমন সময় উত্তর দিক হইতে খুব জোরে বাতাস বহিতে লাগিল, সম্মুখেই বরফের পাহাড়! শীত—প্রবল শীত। সে দারুণ শীতে তাহার প্রাণ যায় আর কি? এখানে গাছ পালা সব বরফে ঢাকা, চারিদিকে শুধু বরফের স্তূপ। রাজপুত্র এইরূপ প্রবল শীতে একেবারে অচল হইয়া পড়িবার উপক্রম দেখিয়া তাড়াতাড়ি বুড়ীর দেওয়া টুপিটী মাথায় পরিলেন, কি আশ্চর্য্য! যেমনি টুপি পরিলেন অমনি অমন যে দারুণ শীত তাহাও দূর হইল। এ গরম টুপি মাথায় দেওয়ায় শীতের বদলে বরং গরম বোধ হইতে লাগিল। গায়ের ঘাম মুছিয়া সূতার গুলির নির্দ্দিষ্ট পথে দ্রুত পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এক যায়গায় সূতার গুলিটী থামিয়া গেল।

ব্যাপার কি জানিবার জন্য সে যায়গার বরফ সরাইলে রাজপুত্র দেখিতে পাইলেন দুইটী মৃতদেহ পড়িয়া আছে। সাজপোষাক দেখিয়া উহা দুইজন রাজপুত্রের দেহ বলিয়া বুঝিলেন; হয়ত তাহারই অগ্রগামী কোন দুর্ভাগ্য রাজপুত্র রাজকুমারীর উদ্ধারের আশায় এখানে আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মৃতদেহ দুইটী পশ্চাতে ফেলিয়া আবার রাজপুত্র পথ চলিতে লাগিলেন। এইবার সেই আগুণের পাহাড়। কেবল দপ্ দপ্ করিয়া আগুণ জ্বলিতেছে। গাছপালা সব পোড়াইয়া অগ্নির হল্কা লইয়া আগির মত বাতাস তীরের মত ছুটিতেছে। যতদূর দৃষ্টি চলে গাছপালা জীবজন্তু কিছু নাই, শুধু অগ্নির প্রবল গর্জ্জন, আর বিরাট আগ্নেয়-পর্ব্বতের ভীষণ রব! সে ভীষণ উত্তাপে তাহার প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, তৃষ্ণায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এইবার তাড়াতাড়ি মাথার টুপিটি খুলিয়া ফেলিয়া বুড়ীর দেওয়া জলের গ্লাসটি মুখের নিকট তুলিবা-

মাত্র শীতল জল পাইলেন, সে শীতল জল পানে তাহার তৃষ্ণা ও ক্লান্তি দূর হইয়া নব জীবন লাভ হইল, নব বলে বলীয়ান হইয়া পুনরায় দ্বিগুণ তেজে সুতার গুলির নির্দ্দেশিত পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই উচ্চ পর্ব্বতশিখরে ঘূর্ণী-দৈত্যের বাড়ীর নিকট গিয়া পেঁাছিলেন।

রাজপুত্র ঘূর্ণী দৈত্যের অপূর্ব্ব বাড়ীটি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। প্রাসাদটী সম্পূর্ণরূপে রজত-নির্ম্মিত। দরজাগুলি লোহায় গড়া এবং ছাত সোণার তৈরী। বাড়ীটি একটি ছোট পাথরের উপর আশ্চর্য্যভাবে অবস্থিত। বাড়ীর ভিতর ঢুকিবার সিঁড়ি প্রকান্ড এক গুহার দিকে ফিরান, সেই গুহা অতল স্পর্শ। কোথায় যে তার শেষ ঠিক নাই, কোনও জীবিত প্রাণীর সেই পথে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করা অসম্ভব। রাজপুত্র দেখিলেন রাজকুমারী একটী জানালার পাশে বসিয়া আকাশ পানে চাহিয়া আছে। তাহার মুখ ম্লান, কালো-ডাগর চোখ দু'টী জলেভরা। রাজপুত্র রাজকন্যাকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেনঃ 'রাজপ্রাসাদ' তুমি তোমার সিঁড়ি আমার দিকে ফিরাইয়া দাও! অমনি ভীষণ শব্দে রাজবাড়ী তাহার দিকে ফিরিয়া আসিল। রাজ-পুত্র ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া সেই প্রাসাদ অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র ভীষণ শব্দে প্রাসাদের সিঁড়ি আবার গুহার দিকে ফিরিয়া গেল। রাজপুত্রকে রাজকন্যা দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল: কে তুমি জানি না, যদি তোমার প্রাণে বিন্দুমাত্র ও মমতা থাকে তবে এখনি পালাও। দৈত্য এল বলে। ঘূর্ণী দৈত্য এলে আর রক্ষা নেই তোমাকে তখনি বধ করে ফেল্‌বে।

রাজপুত্র বলিলেন—রাজকুমারী, যদি তোমাকে আমি রক্ষা কর্‌তে না পারলাম, তবে আমার জীবন বৃথা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি নিশ্চিতই তোমাকে রক্ষা কর্‌তে পারবো। আমি বড়ই তৃষ্ণার্ত্ত হয়েছি, তুমি আমায় জল দাও। রাজপুত্রকে রাজকুমারী তাড়াতাড়ি জল আনিয়া দিলেন, রাজপুত্র জলপান করিয়া বলিলেন: আমার তৃষ্ণা দূর হ'য়েছে, আমায় বস্‌তে একখানা আসন দাও, একটু শ্বাস লইয়া বাঁচি। রাজকন্যা একখানা লোহার আসন আনিয়া দিল, রাজপুত্র ঐ

আসনখানাতে উপবেশন করিবামাত্র উহা খন্ড-বিখন্ড হইয়া গেল, ঘূর্ণী দৈত্য নিজে যে আসন খানায় বসিত এক্ষণে সে আসনখানা রাজপুত্রকে বসিবার জন্য আনিয়া দিল। রাজপুত্রের দেহভারে এ আসন খানা ও নুইয়া পড়িল। রাজপুত্র রাজকুমারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: 'দেখলে রাজকুমারী আমি ঘূর্ণী দৈত্যের চেয়েও ওজনে বেশী আমি তাকে দেখে ভয় করব কেন। সে কোন মতেই আমার সঙ্গে পেরে উঠবে না। বোধ হয় দৈত্যের ফিরে আসবার একটু দেরী আছে। তুমি কি করে এখানে সময় কাটাতে সে কথা বল শুনি।

রাজকন্যা বলিলেন— আমি যে কি কষ্টে কিরূপ মনের দুঃখে কেঁদে কেঁদে সময় কাটিয়েছি তা এক মাত্র জগদীশ্বর জানেন। ঘূর্ণী দৈত্য আমাকে বিয়ে করবার জন্য কত চেষ্টা করেছে কিন্তু আমার কৌশলে সে এপর্য্যন্ত পেরে উঠে নাই। আমার ছয়টী প্রশ্ন আছে, যে এই ছয়টী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে আমি তাকেই বিয়ে করবো, তা ছাড়া অন্য কাকেও বিয়ে করব না। ঘূর্ণী দৈত্য এপর্যন্ত শত চেষ্টা করেও আমার প্রশ্ন ছয়টীর উত্তর দিতে পারে নাই, এবার সে আমায় বলে গেছে জোর করে বিয়ে করবে। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আর অপেক্ষা করবে না। রাজপুত্র হাসিয়া বলিলেন— বেশত তাহলে আমি পুরোহিত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দেবো, এমন সময় বাহিরে একটা ভীষণ শব্দ হইল যেন প্রলয়কাল উপস্থিত! শত শত বন্দুক কামান একত্র গর্জ্জন করিয়া উঠিলে যেমন শব্দ হয় ঠিক তেমনি শব্দ। রাজকন্যা আকুল কন্ঠে বলিলেন 'রাজপুত্র সাবধান! সাবধান! ঐ ঘূর্ণী দৈত্য আসছে।

দেখিতে দেখিতে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া দৈত্যরাজ রাজপুত্র ও রাজকন্যা যেখানে বসিয়াছিলেন ঠিক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। রাজপুত্রকে দেখিতে পাইয়া ঘূর্ণী দৈত্য অগ্নি বমন করিতে করিতে ভীষণ রবে তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইল। এদৈত্যের আকৃতি অতি অদ্ভুত। সারাদেহ মানুষের মত আর মুখটা পশুর মত। রাজপুত্র দৈত্যকে আসিতে দেখিয়া এক লম্ফে তাহার কন্ঠ চাপিয়া ধরিলেন এবং এক মুষ্ট্যাঘাতে তাহাকে বধ করিলেন। রাজকন্যা রাজপুত্র ও দৈত্যের ভীষণ যুদ্ধ দেখিয়া একেবারে অচৈতন্য

হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন জ্ঞান লাভ করিয়া রাজপুত্রের এইরূপ বীরত্বের জন্য অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্র রাজকন্যাকে সহ একটী পাত্রে সঞ্জীবন জল লইয়া পক্ষীরাজ ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন।

রাজপুত্রের মনে ছিল তাঁর বুড়ীর কাছে প্রতিশ্রুতি, তাই রাজকন্যাকে ও ঘোড়ার পিঠে সহ আসিলেন সেই বুড়ীর কুটিরে। তাকে দিলেন সঞ্জীবনী জল। বুড়ি সেই জল পাইয়া মহাখুশী হইল এবং সেই সঞ্জীবনী সুধা পান করিয়া ফিরিয়া পাইল তার লুপ্ত যৌবন। তার সারাদেহে বিকশিত হইল নবযৌবনশ্রী।

বুড়ী আর নয় সেই বৃদ্ধা, তরুণী হইয়া মনপ্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন: রাজা হও। তোমাদের যাত্রাপথ শুভ হবে, তোমরা সুখী হবে।

এক সুন্দর প্রভাতে রাজপুত্র রাজকন্যাকে সহ ফিরিয়া আসিলেন রাজধানীতে; রাজা ও রাণীর আনন্দের অবধি নাই। রাজধানীতে আনন্দের বাজনা বাজিল। তারপর এক শুভ্র জ্যোৎসনা নিশীথে শুভলগ্নে রাজপুত্র ও রাজকন্যার বিবাহ হইল। রাজা তাঁর বিবাহের যৌতুক স্বরূপ দিলেন রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ।

রাজপুত্র ও রাজকন্যার দিন সুখে ও শান্তিতে কাটিতে লাগিল।

এক যে ছিলেন রাজার কুমার

সে অনেকদিন আগের কথা।

কতদিন আগের কথা, সে আমি বলতে পারবোনা। রাজা আর রাণী। তাঁদের ছিল একটিমাত্র ছেলে। যাদের একটিমাত্র ছেলে, তাদের চিন্তা ও ভাবনা ত খুব বেশী থাকে।

দিন এগিয়ে এলো অন্নপ্রাশনের। রাজা সুধালেন রাণীকে কি ভাবে উৎসব করবে বলতো?

রাণী বললেন—রাজ্যের যেখানে যত জ্ঞানী, গুণী বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক আছেন তাঁদের সকলকে নিমন্ত্রণ করবে। দেখে যাবেন আর আশীর্বর্বাদ করবেন রাজকুমারকে।

রাজা বললেন: ঠিক্ কথা।

তবে তিনি করলেন আর একটি কাজ, সে হচ্ছে রাজ্যের সব পরীদের নিমন্ত্রণ—পাছে শুধু মানুষ নন, এইসব দেবলোকের অধি-বাসিনী পরীরাও রাজপুত্রকে দেখে মঙ্গলকামনা করেন এই ছিল রাজার অভিপ্রায়।

রাজ্যে—রাজধানীতে বেজে উঠল—উৎসবের বাজনা। কত বাঁশী, কত ঢাক-ঢোল, মুরজ, বেহালা বেজে উঠলো। ব্রাহ্মণেরা পেলেন দক্ষিণা, টাকা কড়ি মোহর, গরীবেরা পেল নূতন কাপড় নূতন জামা। রাজার ছেলের অন্নপ্রাশন এত সহজ কথা নয়!

পরীরা এলেন। পরীর রাজা রাণী সকলে এলেন। যাতে তাঁরা অপ্রসন্ন না হন, সেজন্য করেছিলেন নানা রকমের প্রচুর খাবার, তাদের বসবার জন্যে ঘরটি সাজিয়েছিলেন নানা ফুল পাতা লতায় শোভন ও মনোহর করে।

রাজার ছেলের অন্নপ্রাশন। আবার কিনা রাজারাণীর একটিমাত্র ছেলে—

রাজার নিমন্ত্রণে সব পরীরা এলেন উৎসবে; সঙ্গে নিয়ে এলেন নানা সুন্দর সুন্দর উপহার। কোন পরী নিয়ে এলেন রাজপুত্রের

স্বাস্থ্য, কেউ আনলেন অর্থ-সম্পদ, কেউ নিয়ে এলেন সুখ-শান্তি, কেউ বা নিয়ে এলেন বিদ্যা ও গুণ—শিল্প, কেউ নিয়ে এলেন প্রতিভা—রাজা ও রাণী এমন সব শ্রেষ্ঠ উপহারই চেয়েছিলেন, এমনকি একজন পরী সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি আনতেও ভুলেন নি।

তাঁরা এই যে সব উপহার এনেছিলেন রাজকুমারের জন্য সে সব রাজপুত্রের মাথার মধ্যে ভরে দেওয়ার পরিবর্তে এই সব অদ্ভুত ও বিচিত্র দান এনেছিলেন সুন্দর সোনা, রূপা, হীরা জহরতে তৈরী করা ছোট ছোট কৌটায় ভরে। এসব সোনা, রূপা, হীরা জহরতে তৈরী

পরীরা দিলেন একে একে উপহার

কৌটার অপরূপ ছিল রূপসজ্জা, কোনটিতে হীরা মাণিক, নীলা মরকতের লতা পাতা, কোনটিতে ছিল মুক্তোর লতা, অপূর্ব সুন্দর সে-সব কৌটা।

একজন পরী ছোট একটি কৌটোয় ভরে উপহার দিলেন রূপ—মানে দেহের সৌন্দর্য্য, আর এক পরী দিলেন কৌটোয় ভরে মনের প্রকৃতি বা ভাল মেজাজ—এক প্রাচীনা পরী, তাঁর পা দুটো ছিল যেমন লম্বা, তেমনি মোটা। ধীরে ধীরে এসে একটি কৌটোয় ভরে উপহার দিলেন সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি—এমন সুন্দর উপহার পৃথিবীর কোন রাজপুত্র পেয়েছেন কিনা তাত জানিনা।

পরীরা ত উপহার দিয়ে গেলেন, নানাজনে নানাভাবে—কিন্তু এগুলি রাজপুত্রের ছোট মাথা বা মগজের মধ্যে কি করে ভরে দেওয়া যায়, মাথার ভিতর এত সব গুণের দান যদি প্রবেশ না করে, তবে রাজপুত্রের কি লাভ হবে?

রাজা ও রাণী পড়লেন মহা সমস্যায়। একই কথা—একই চিন্তা, কি করা যায়।

রাজা ডেকে পাঠালেন রাজ্যের মন্ত্রী, গুণী, জ্ঞানী, বিদ্বান সকলকে: বললেন এক দরবার ডেকে সব কথা, বললেন: বলুনত এতগুলি অমূল্য উপহার রাজপুত্রের মাথার ভিতরে কেমন করে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়।

সেই সব গুণী জ্ঞানীজনেরা মাথা নেড়ে নেড়ে গোঁফে দাঁড়িতে হাত দিয়ে বললেন—না না—আমরা পারবোনা মহারাজ—আমাদের বিদায় দিন। একি সহজ ব্যাপার!

এদিকে রাজা ছিলেন মহারাগী—তিনি রেগে বললেন—যান্ যান্ আপনারা বেরিয়ে যান্ রাজপুরী থেকে! আপনারা কেউ কিছু জানেন না—মিছিমিছি করেন বিদ্যার বড়াই। এক্ষুনি চলে যান।

রাজার ধমক খেয়ে পন্ডিতের দল মুখ কাচুমাচু করে ভয়ে ভয়ে পালিয়ে গেলেন যাঁর যাঁর বাড়ী।

একজন পন্ডিত চুপ করে এক পাশে বসেছিলেন, তিনি বললেন—মহারাজ, আমাদের বুদ্ধিতে যখন কুলোল না, তখন আপনি রাজ-চিকিৎসকদের ডেকে পাঠান, যদি তাঁরা পারেন এর কোন উপায় বার করতে!

রাজা বললেন—হাঁ, বেশ। নাড়লেন মাথা।

লোক ছুটলো রাজবাড়ীর চিকিৎসকদের ডাকতে। রাজার চিকিৎসকেরা ত হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। রাজা মশায়কে প্রণাম জানিয়ে বললেন, কি হয়েছে মহারাজ!

রাজা বললেন সব কথা।

চিকিৎসকদের কথায় রাজা ডেকে পাঠালেন রাজপুত্রকে। ছোট সুন্দর টুকটুকে ছেলেটিকে আনান হলো দরবারে। চিকিৎসকেরা চশমা এঁটে, মাথা টিপে, নাড়ী ধরে বহুক্ষণ পরীক্ষা করে গম্ভীর ভাবে বললেন: মহারাজ এ আর এমন কি কঠিন কাজ।

রাজা হুঙ্কার দিলেন।

সে ত হুঙ্কার নয়—যেন বজ্র বুকে নিয়ে মেঘ গর্জন করছে। বলুন, কি করতে চান।

বৃদ্ধ বিজ্ঞ চিকিৎসক মাথা নেড়ে বললেন—আমরা ভেবেছি, রাজপুত্রের মাথার খুলি খুলে তার ভিতরে এই সব উপহার দিব ভরে। তারপর আবার মাথার খুলি দিব এঁটে সেঁটে ঠিক্ করে, কোন ভয় করবেন না মহারাজ! রাজকুমারের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু তার আগে......

বললেন আর একজন চিকিৎসক—মাথাটা খুলবার আগে দেখে নিতে হবে মগজের ভিতর খালি যায়গা আছে কি না! তখন দু'দিক থেকে চিকিৎসকেরা রাজকুমারের মাথা নিয়ে নাড়া চাড়া ও টেপাটোপ সুরু করলেন—

শেষটায় তাঁরা বললেন—হুঁ সব ঠিক্ আছে—

রাজা কোন কথা বললেন না।

চিকিৎসকেরা মাথার খুলি খুলে দেখলেন, ঢের খালি যায়গা আছে। তাঁরা ধীরে ধীরে পরীদের দেওয়া সব উপহার ভরে দিলেন ঠেসে। খালি মগজ পূর্ণ হ'ল। সব ভরা হলে তাঁরা একটি রেশমী রুমাল বেঁধে দিলেন শক্ত করে রাজকুমারের মাথার নীচে।

এই ভাবে দিনে দিনে রাজপুত্র নানা গুণে হলেন গুণী। কিন্তু রাজপুত্র তার মস্তবড় মাথাটা নিয়ে সকল সময় অসোয়াস্তি বোধ করেন। এত সব বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞানের বোঝার ভারে তাঁর মাথাটা থাকে না সোজা। তিনি দাঁড়িয়ে সোজাভাবে চলতে পারেন না।

এদিকে ওদিকে হেলে পড়েন। এজন্য তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকে দু'জন প্রহরী, দুই দিকে ধরে ধরে তাঁকে নিয়ে চলে ভারসাম্য রক্ষার জন্য।

এমন অন্যায় ব্যবস্থায় রাজার হলো ভয়ানক রাগ। তাঁর হুকুমে একটী ঘরে সেই সব বিদ্বান বুদ্ধিমানদের আটকে রাখা হলো। মোট কথা তাঁদের করা হলো বন্দী।

বেচারারা কারাবন্দী হয়ে দুঃখ করেন। হায়! হায়! কি করা যায়।

তাঁদের একজনের মাথায় এল এক নূতন বুদ্ধি। তিনি বললেন—বেশত রাজামশাইকে বলে রাজকুমারের মাথা খুলে সব কিছু উপহার বের করে মাথাটা হালকা করে ফেলে একটি একটি করে এক এক বার পরীদের উপহার মাথায় ভরে দেওয়া যাক্। একবারে একটি বা দুটির বেশী নয়। রাজাকে জানালেন একজন সাহস করে এ-খবর।

সকলে বললো: বেশ হবে।

রাজা হলেন খুশী।

রাজবাড়ীর চিকিৎসকরা রাজপুত্রের মাথার পেছনটা খুলে তাকে করা হলো একটি ছোট বাক্সের মত। মাথার খুলি দিয়েই করা হলো একটি দরজা, যেমন থাকে বাক্সের। সেই ব্যবস্থা হলো। একে একে পরীদের দেওয়া সব সোনা, রুপা, জহরতের বাক্সগুলি খুলে সরিয়ে রাখা হলো।

রাজপুত্রের ছিলেন যিনি উপদেষ্টা বা পরিচালক তাঁর এই ব্যবস্থা খুবই ভাল লাগলো। রাজপুত্রও হলেন মহাখুশী—বেশ আরাম হলো তাঁর—মগজে রইল শুধু সৌন্দর্যের কৌটো। রাণীমা কোন রকমেই সেটি খুলে নিতে দেননি। সৌন্দর্যের কৌটোটি মাথার ভিতরে থাকায় রাজকুমারের সৌন্দর্য সম্পর্কে বেশ জ্ঞান ছিল। কোথাও বেড়াতে যেতে হলে কোন্ পোষাক পরলে তাঁকে মানাবে-ভালো। সকলে বলবে কি সাজেই না সেজেছেন রাজকুমার! এই যে সাজগোজ, পোষাক পরিচ্ছদ এদিকে ছিল জ্ঞান একেবারে যাকে বলে টন্‌টনে।

রাজকুমার ক্রমে ক্রমে বড় হলেন। রাজা নিয়ে যেতেন সাথে

করে, যেখানে সৈন্যদের হত কুচকাওয়াজ,—দেখতেন শুধু রাজকুমার; কোন কথা, বলতেন না। চেয়ে থাকতেন নিমেষহারা! রাজা নিজে সাথে করে নিয়ে যেতেন রাজদরবারে, যেখানে লোকজন আসতো বিচারপ্রার্থী হয়ে। রাজকুমারের উপর পড়ত বিচারের ভার। এদিকে হয়েছে কি, রাজপুত্রের যিনি ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক, তিনি রাজপুত্রের মগজে ভরে দিতে ভুলে গিয়েছিলেন বিচার বুদ্ধি বা সাধারণ জ্ঞান বা বিবেক। কাজেই ঘটত নানা বিড়ম্বনা! শোন তার গল্প দু' একটি!

প্রজারা সব রাজকুমারের কাছে হলো বিচারপ্রার্থী। রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হয়েছে। ঘরে ঘরে অশান্তি। খেতে পায়না, পরতে পায়না তারা, ঘরে খাবার নেই, ফসল সব পুড়ে গেছে অনাবৃষ্টিতে। আকাশে মেঘ নাই, ক্ষেত মাঠ শুকিয়ে গেছে চৌচির হয়ে। খাল, পুকুরে নহে জল।

রাজকুমারের মগজের ভিতর বিজ্ঞান গজ গজ করছে। তিনি বললেন নানা বিজ্ঞানের কথা, আকাশের পানে চেয়ে থাকলে ত চলবেনা! খাল কাট, মাঠে মাঠে জল সেচন কর—চাষ কর, বিজ্ঞান শেখ, চীন দেশের ধরণে চাষ কর, ক্ষেতে ক্ষেতে হবে সোনার ফসল। দুর্ভিক্ষ রইবেনা। রাজকুমার দিলেন লম্বা বক্তৃতা, সে বক্তৃতার শেষ নেই। গরীব চাষীরা কত মিনতি করলো, কত আবেদন নিবেদন করলো, কত কাঁদলো—রাজকুমারের মাথায় বিজ্ঞান বাসা বেঁধেছে.... বললেন চীনের ধান চাষের কথা, জাপানের চাষের কথা! করো সেই ভাবে চাষ—প্রচুর ফসল হবে।

কাঁদতে কাঁদতে শূন্য হাতে চলে গেল চাষী ও ভিখারীর দল।

আর একদিন রাজকুমারের কাছে এল আর একদল প্রজা। তারা দিতে পারেনা খাজনা, টাকাকড়ি নেই, খাবার নেই—বললে তারা আমাদের খাজনা মাপ করুন। রাজকুমার হুকুম দিলেন—কর্ম্মচারীদের,—কোড়া মেরে আদায় কর খাজনার টাকা। জ্বালিয়ে দেও ঘরদোর। সৈন্যদের হুকুম দিলেন দূর করে দাও বেত মেরে এদের—খাজনা দেবে না! এ কি কথা।

তারা কাঁদতে কাঁদতে অভিশাপ দিতে দিতে চলে গেল।

আবার রাজ্যের মন্ত্রীরা ঠিক করলেন রাজ্যের উন্নতির জন্য

প্রজাদের উপর কর বসানো হোক। টাকা না হলে ত দেশের উপকার হবে না। এই কর আদায় হলে অনেক টাকা আসবে এবং সে টাকা দিয়ে রাজ্যের অনেক কিছু পরিকল্পনা হবে সফল!—মন্ত্রীরা প্রজা-দের উপর নানা কর বসাবার হিসাব নিকাশ নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলেন রাজকুমারের কাছে। সব শুনে রাজকুমার বললেনঃ—আহা! হা! গরীব প্রজাদের উপর কর বসাতে আপনাদের লজ্জা করে না! মোটা মোটা টাকা নিজেরা ঘরে নিয়ে গিয়ে মজায় থাকেন—আর গরীবের উপর বসান কর! যেমন করে পারেন আপনারা রাজভবন হতে এদের প্রত্যহ খাদ্য যোগাবেন। আপনারা আরাম করবেন, আর গরীবেরা করবে হাহাকার—সে হবেনা। আমি এদের খাজনা মাপ করলুম। এই রাজ্যের উন্নতির পরিকল্পনার টাকা দিতে হবে আপনাদের। মাইনের নামে গরীবদের শোষণ করে নিবেন মোটা টাকা। লজ্জা হয়না আপনাদের।

মন্ত্রীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন! ভাল করতে গিয়ে হল মন্দ। এ কি বিচার হল। মন্ত্রীরা খাতাপত্র খুলে কত মাথা নেড়ে—চশমা খুলে বক্তৃতা দিলেন—রাজকুমারের ঐ এক কথা!—নিজেরা টাকা দিন। গরীব লোকেরা কোথা থেকে টাকা দিবে।

সকলে কেঁদে মাথায় হাত দিয়ে হাহাকার করে দরবার হতে চলে গেলেন।

এমনি ছিলেন খেয়ালি রাজকুমার।

রাজকুমারও কিন্তু তাঁর সাধারণ জ্ঞান বর্জ্জিত হয়ে মনে মনে ছিলেন খুবই অসুখী! কিন্তু সত্যকথা বলতে কি তাঁর মাথা থেকে যে সাধারণ জ্ঞানের বাক্সটি খুলে নেওয়া হয়ে গেছে। কাজেই দোষ ত তাঁর নয়। জ্ঞান, বুদ্ধি বিবেচনা তাঁর নাই—যখন যে খেয়াল হয় তখনি তাই করেন, তাই বলেন। রাজ্য জুড়ে অশান্তি! রাজা ভাবেন এ কেমন হলো!

গ্রীষ্মকাল। ভয়ানক গরম। এমনি এক রাত্রিতে রাজকুমার ক্লান্ত শরীর নিয়ে শুয়ে পড়েছেন। একটি খোলা জানালা দিয়ে বেশ ঠান্ডা বাতাস ঝির ঝির করে বয়ে আসছে। সামনে ছোট টেবিল। তার উপর পড়েছিল সোনার কৌটায় ভরা তাঁর সাধারণ জ্ঞান। একটি

তাঁর মগজে ভরে দিতে চিকিৎসকেরা ভুল করে বসেছিলেন। রাজকুমারের ঘুমের ঘোরে হাত লেগে সেই বাক্সটি পড়ে গিয়েছিল বাইরে বাগানের ভিতর। সেখানে ছিল একরাশ রজনীগন্ধার ঝাড়! পাশে ছিল একটি সুন্দর ঝরণা। ঝির ঝির করে বয়ে যাচ্ছিল। কুল্ কুল্ করে গান গেয়ে।

পরদিন ভোরের বেলা এক গোয়ালার মেয়ে—সে ছিল দেখতে পরমাসুন্দরী। দুধ যোগান দিতে রাজবাড়ীর বাগানের পথে যেতে তার চোখে পড়লো সেই সুন্দর ছোট সোনার কৌটা। সে বাক্সটি

গয়লার মেয়ের চোখে পড়লো ছোট সোণার কৌটা

হাতে তুলে নিয়ে খুলে দেখলো—তার ভিতর ভরা রয়েছে অনেকগুলি সাদা সাদা গুঁড়ো। ভারি সুন্দর ত। সে তাড়াতাড়ি মনে করলো জল দিয়ে গুলে খেলে হবে চমৎকার সরবৎ! সে ঝরণার জল তার দুধ দেওয়ার বাটিটি ভরে সাদা সাদা গুঁড়ো মিশিয়ে খেয়ে ফেললো। কিন্তু খেতে তার মোটেই ভাল লাগলো না। এ ত সরবৎ নয়, কেমন যেন বিস্বাদ! কিন্তু সে তো জানতো না—সে যে রাজকুমারের সাধারণ জ্ঞানটুকু কৌটো হতে খুলে খেয়ে ফেলেছে। বুঝতে পারেনি সে কি খেলো।

মহারাজ এইটি আমি বাগানে কুড়িয়ে পেয়েছি

সেই যে গোপকন্যা তার এখন বেশ বুদ্ধি হল। সে তার সাধারণ জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারলো—ঐ কৌটোটি সোনার। সে ছিল খুব ভাল। তার মনে হলো, নিশ্চয়ই রাজবাড়ীর কেউ ভুল করে এই সোনার কৌটাটি বাগানে ফেলে গেছে। যখন রাজার বাড়ীর বাগানের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে, তখন নিশ্চয়ই এইটি হবে রাজপুরীর কারো। সে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলো রাজপুরীতে। বাজালো সিংহ দরোজার ঘন্টা......বেজে উঠলো ঢন্ ঢন্ !

রাজা ঘন্টাধবনি শুনে নিজে এলেন ছুটে। গোয়ালার মেয়ে তাঁর হাতে সোনার কৌটোটি দিয়ে বললে: মহারাজ! এটি আমি বাগানে কুড়িয়ে পেয়েছি।

রেগে জিজ্ঞেস করলেন রাজা, তুই কোথায় পেলি বল সত্য করে।

গোপকুমারী আগাগোড়া সব কথা বলে গেলো।

রাজা রেগে চীৎকার করে ডাকলেন প্রহরীদের, সৈন্যদের। সকলে হৈ হৈ করে ছুটে এসে বললো—কি হয়েছে মহারাজ! কি হয়েছে? কি হয়েছে? রাজা বললেন—এই গোয়ালার মেয়েটা রাজকুমারের সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি খেয়ে ফেলেছে। এই যে খালি সোনার কৌটো পড়ে আছে।

—এক্ষুনি এঁকে শিকল দিয়ে বেঁধে দুর্গের ভিতর যে গুহা ঘর আছে সেই পাতালপুরে রেখে এসো! যাও—

রাজার হুকুম!

আর কি দেরী করা চলে! প্রহরীরা, সৈন্যেরা নিয়ে গেল ধরে বেঁধে মেয়েটিকে। রাজা চীৎকার করতে করতে গেলেন রাজপুরীতে। মহাচিন্তায় পড়লেন রাজা। রাজপুত্রের কি এ জন্যই ঘটে নানা বুদ্ধি বিভ্রম!

রাজা হায় হায় করতে করতে ঢুকলেন রাজবাড়ীতে। ছুটে গেলেন অন্দরে।

রাজকুমার শুয়ে আছেন নীরবে তাঁর ঘরে। রাজা হুকুম দিয়েছেন, রাজকুমারের বুদ্ধি বিবেচনা বড় কম। কিছু বুঝেন না, জানেন না, পদে পদে তাঁর সাধারণ জ্ঞানের অভাবে ঘটে বিভ্রাট। তাই রাজকুমার আছেন তাঁর ঘরে বন্দী।

রাজা বল্লেন শোন পুত্র, আমি বুঝতে পেরেছি কেমন করে তুমি তোমার পরীদের দেওয়া সব উপহার হারিয়ে ফেলেছো। রাজা সেই সোনার কৌটোটি রাজকুমারের কাছে রেখে, গেলেন চলে দরবারে!

রাণী সব শুনে বললেন—দেখ কুমার, তোমাকে আমি এই যে সব নানাবিধ গুণের দান পরীদের দেওয়া কৌটো রয়েছে সে সব জলে গুলে তোমাকে একসঙ্গে খাইয়ে দেব। তাহলে ঘুচে যাবে তোমার সব নিন্দা অপবাদ।

রাজকুমার মায়ের দেওয়া গ্লাসে মেশানো সব কিছু পরীদের দান, ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ফেললেন। দেখতে দেখতে রাজার ছেলে রূপে গুণে, বিচার বুদ্ধিতে সবভাবে চরিত্রে সৌন্দর্যে হলেন অতুলন। পেলেন না শুধু সাধারণ জ্ঞান—সেত খেয়ে ফেলেছে সেই গোপকন্যা।

কাজেই রাজপুত্রের অভাব রইল শুধু সাধারণ জ্ঞানের।

রাণী বললেন রাজাকে সব কথা।

রাজা উত্তর করলেন, সব ত বুঝলাম কিন্তু কুমারের যে সাধারণ জ্ঞানই নেই।

তাতে কি হবে? রাজার ছেলে, রাজরক্ত যার শিরায় বয়ে যাচ্ছে তাঁর সাধারণ ভালমন্দ জ্ঞান না থাকলে বড় বয়ে গেল--কি ক্ষতি হবে তাঁর।

রাজা নাড়লেন মাথা। বললেন সে হয়না রাণী, সে হয়না! আমি গোয়ালা মেয়েটাকে কারাগারে রাখবো বন্দিনী করে যতদিন পর্যন্ত সে না ফিরিয়ে দিতে পারে রাজপুত্রের সাধারণজ্ঞান! কিন্তু কে শুনবে রাজার কথা। রাণী ততক্ষণ সেই ঘর ছেড়ে গেছেন চলে!

রাজকুমার একে একে সব কথা শুনলেন। শুনলেন সেই পরমাসুন্দরী গোপকুমারীর কথা। নির্দোষী বেচারী সে থাকবে কারাগারে বন্দিনী হয়ে—এই কি হলো রাজার বিচার! নানা গুণ জ্ঞান এখন রাজকুমারের মাথায় এসেছে—যদিও সেই মেয়েটিকে তিনি দেখেন নাই--তবু তাঁর মনে জাগলো বেদনা! নির্দোষী বেচারী আহা! হা! সে কিনা হলো বন্দিনী।

গভীর রাত্রি। রাজপুরীর সকলে ঘুমিয়ে আছে। সেই সুযোগে রাজকুমার চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লেন রাজপুরী হতে, ধীরে ধীরে গেলেন পাতালপুরীর কারাগারে। প্রহরী ঘুমিয়ে

পড়েছে। দরজার কাছে চাবি রয়েছে ঝুলানো। ধীরে ধীরে কারা-দ্বার খুললেন কুমার। ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন—অন্ধকার সে কারাকক্ষ। একপাশে ছোট একটি আলো মিটি মিটি করে জ্বলছে। দেখলেন কুমার, সেই মেয়েটি পাথরের মেজের উপর শুয়ে রয়েছে, হাতে পায়ে লোহার শৃঙ্খল। সে ঘুমের ঘোরে কেঁদে

মেয়েটি পাথরের মেজের উপর শুয়ে আছে

উঠছে! অপূর্ব্ব সুন্দরী সে। মলিন পোষাক, জীর্ণ বসন। কিন্তু তবু সে তার রূপে কারাঘরের অন্ধকারকেও উজ্জ্বল করে ফেলেছে।

রাজকুমার মেয়েটিকে দেখে তাকে ভালবেসে ফেললেন। কিন্তু তাঁর ত সাধারণ জ্ঞান নেই, কি করে তাকে উদ্ধার করবেন—এই অন্ধকার কারাগার থেকে, সে বুদ্ধি তাঁর মাথায় এলোনা। রাজকুমার বসে রইলেন মেয়েটির পাশে স্যাঁতসেঁতে অতি ঠান্ডা পাথরের মেজে। আপনার কোলে তুলে নিলেন তার মাথাটি। আষাঢ়ের কাজল কালো মেঘের মত মেয়েটির চুলগুলি লুটিয়ে পড়লো চারদিকে। ঘুমের ঘোরে মেয়েটি মাঝে মাঝে হাসছিলো—যেন ফুলের হাসি আর কি?

ভোর হল।

রাজকুমারকে তার পাশে বসে থাকতে দেখে ভয় পেয়ে গেলো—ভয়ে সে কেঁদে ফেললো।

রাজকুমার তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন কোন ভয় করোনা—কেঁদোনা, আমি তোমাকে ভালবাসি। আমাকে তুমি বিয়ে করবে?

মেয়েটি বললো—ওগো! না, না, সে কি হতে পারে? তুমি হলে রাজকুমার। আমি হলেম গরীব গোয়ালার মেয়ে! তোমার কি এই সাধারণ জ্ঞানটুকুও নেই রাজপুত্র।

আমার ত তা নেই, ভালই হয়েছে, তাহলে হয়ত আমি বলে বসতুম না গো না! তোমায় আমি বিয়ে করবো না।

এদিকে রাজকুমার যতই বলে ওগো! মেয়ে আমি তোমাকে খুব ভালবাসি। খুব—খুব—খুব ভালবাসি!

মেয়েটি বলে—না—না—সে হয় না, হতে পারে না। আমি যে গরীব গোয়ালার মেয়ে।

তারা দুইজনে যখন এইভাবে কথা বলছে এবং তাতেই ছিল তন্ময়। কোন দিকে কোন লক্ষ্য করেনি। শোনেনি দরজার কাছে পায়ের শব্দ—দপ্ দপ্ দপ্ দপ্।

রাজা সদল বলে রাজসভাসদদের নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন কারাগারে। রাজকুমারকে সেখানে দেখে সকলে হলেন অবাক! একি

রাজা গেলেন ভয়ানক রেগে—তিনি রাজকুমারকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বন্দী করে রাখলেন রাজপুরীতে তাঁর ঘরে।

রাজা ডাকলেন দরবার। বললেন সকলকে—বলুনত সবাই—কি করা যায় এই রাজকুমার ও এই গোয়ালার মেয়েটিকে নিয়ে।

এই সভাসদ দলের মধ্যে একজন জ্ঞানী, নিজেকে তাই মনে করতেন।

রাজাকে বললেন—আপনি এই মেয়েটীকে আমার কাছে সঁপে

রাজপুত্রকে বন্দী করে নিয়ে যাও—এক্ষুনি

দিন। আমি এর কাছ থেকে রাজকুমারের সাধারণ জ্ঞান ও বিবেক আন্‌বো ফিরিয়ে।

রাজা তাঁর হাতে সঁপে দিলেন সেই গোপকন্যাকে। কারাগার হতে সেই বুদ্ধিমান্‌ সভাসদ নিয়ে গেলেন—সেই সুন্দরী কুমারীকে তার সাথে।

এই যে সভাসদ বা জ্ঞানী মন্ত্রী মহাশয় ছিলেন অতি চতুর!

বললেন সেই মহাজ্ঞানী লোকটি—দেখ তোমার মাথা চিরে আমি বের করে নিব রাজকুমারের সাধারণ বুদ্ধি ও জ্ঞান।

মেয়ে বললে—সে হবে না। কিছুতেই আমি তা করতে দিব না। আমার মগজ দিব বিলিয়ে—হবে না—হবে না—হবে না—

ভেবে দেখলেন মহাজ্ঞানী এভাবে যখন হবে না তখন কোন কৌশলে যে করেই হউক একে মেরে ফেলতে হবে। তারপর যা করবার করা যাবে। কিন্তু মনের ভাব গোপন রেখে বললেন—চল বাগানে বেড়িয়ে আসি।

সরলা গোপকুমারীর মনে কোন সন্দেহই জাগেনি—দুজনে পাশাপাশি বেড়াতে বেড়াতে একটা মস্ত বড় কুয়োর পাশে এলেন। যখন মেয়েটি মাথা নীচু করে কুয়োর ভিতর কি আছে দেখতে গিয়েছে, সে সময়ে মহাজ্ঞানী সভাসদ তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন কুয়োর ভিতর।

তখন সেই চতুর মহাজ্ঞানী মন্ত্রী মশাইয়ের মনে হল যে গোয়ালার মেয়েটি নিশ্চয়ই কূপের ভিতর পড়ে মারা গিয়েছে তখন তিনি তার মৃতদেহ টেনে উপরে তোলবার জন্য দড়ি ফেলে বর্শী ফেলে এবং নানা রকমে চেষ্টা করলেন কিন্তু কোন ফলই হল না।

আসল কথা সেই কুয়োর ভিতর জল ছিলনা। মেয়েটি পড়ে গিয়ে কুয়োর ভিতরে পাথরের উপর বসেছিল। কতক্ষণ যে গোপ-কুমারী কুয়োর ভিতরকার পাথরের উপর বসেছিল সেকথা আমি বলতে পারবো না। মেয়েটি ছিল বুদ্ধিমতী। তারপর সে পেয়েছে রাজকুমারের সাধারণ জ্ঞান—কাজেই সে বুঝলো—চুপচাপ পাথরের উপর বসে থাকা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। আর রাজকুমার? তার মাথায় ত কোন বুদ্ধিই ছিলনা। রাজকুমারের অন্যসব নানা গুণ

থাকলে কি হবে—সাধারণ বুদ্ধি ত ছিলনা। কাজেই কি যে করবে ভেবেই পাচ্ছিল না।

রাজকুমার খুব মিষ্টি জিনিষ খেতে ভালবাসতেন—কি করে সেই মেয়েটিকে উদ্ধার করা যায় তাই হলো তাঁর মস্ত ভাবনা। ভাবতে ভাবতে তাঁর শোবার ঘরের বিছানার পাশে যে পরীদের দেওয়া একটি ছোট রূপোর বাক্স ছিল সেটি খুলে ফেলে তার ভিতর পেলেন কতকগুলি বাদাম দিয়ে তৈরী মিষ্টি—খেতে খেতে তার নিজের মাথায় এলো এক খেয়াল! সে ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে এসে রাজাকে বললো—বাবা! বাবা! আমি—এই গোপ কন্যাকে বিয়ে করবো! মেয়েটি দেখতে এমন সুন্দরী যে যদি তাকে আমি বিয়ে করি তবে আমার সাধারণ জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক, চিন্তা শক্তি সব ফিরে আসবে।

রাজা রাণীর ত সবে মাত্র একটি ছেলে! রাজা বললেন—বেশ কথা, কুমার তাই হবে! কিন্তু সেই গোপ কুমারীটি কোথায় খুঁজে বের করতে হবে। যদি তাকে পাওয়া যায় কালই দিব তাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ে।

একটি মাত্র ছেলে তার কোন আবদার কি ফেলা যায়! রাজা আর রাজকুমার দু'জনে বের হলেন মেয়েটিকে খুঁজে বার করতে। কোথায় সে? কোথায় সে! সন্ধান দিলে না কেউ।

এদিকে সেই যে দুষ্টু বুদ্ধির মন্ত্রী মশাই তিনি তখনও কুয়োর ভিতর বর্শী ফেলে মেয়েটির মৃতদেহ টেনে তুলে কোথাও কোন গোপন স্থানে মাটি চাপা দিয়ে লুকিয়ে রাখবেন ভেবেছিলেন। যেমন শুনলেন রাজা ও রাজকুমার সেদিক পানে ছুটে আসছেন, তখন আর যাবেন কোথায় একেবারে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেলেন!

কোথায় কোথায় সে গোপকুমারী?

রাজকুমার হতাশ হয়ে পড়লেন।

রাজা সেই দুষ্ট বুদ্ধি মহাজ্ঞানী লোককে দেখালেন নানা গুরুতর শাস্তির ভয়!

নানা শাস্তির ভয়ে কাঁপতে লাগলেন বুদ্ধিমান লোকটি। এ-সময়ে বাগানের মালী বৌ এক জোড়া ছোট চটি জুতো হাতে করে এসে রাজা ও রাজকুমারকে দেখালেন।

চমকে উঠলেন রাজকুমার।

রেগে গেলেন রাজা!

কোথা থেকে পেলে এই জুতো জিজ্ঞাসা করলেন রাজা।

মালী বৌ বললো -পেয়েছি মহারাজা কুয়োর পাশে। রাজা ও রাজকুমার বলে উঠলেন একসাথে—নিশ্চয়ই গোপকুমারী রয়েছেন কুয়োর ভেতর।

সত্যিই ছিল সে কুয়োর ভেতর।

আসন্ন বিপদ বুঝে সেই যে দুষ্ট জ্ঞানী লোকটি সে গোলমাল হৈ-চৈএর মধ্যে গেল পালিয়ে।

তারপর গোপকন্যাকে কূপ হতে উদ্ধার করা হলো। তার মুখে ফুটলো হাসি।

সে রাজার ছেলে ও রাজার মধুর ব্যবহারে হল মহাখুসি।

তারপর রাজ্য জুড়ে আবার বাজলো বাজনা। গোপকুমারী ও রাজার ছেলের হলো বিবাহ।.........রাজা-রাণী রাজপুত্র ও তাঁর স্ত্রীর হাতে রাজ্য শাসনের ভার দিয়ে গেলেন বনে, ধ্যান-ধারণার জন্য।

এদিকে নূতন রাজা ও রাণী অতি সুন্দরভাবে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন- চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেলো। কিন্তু কেউ ত জানত না যে—কার বুদ্ধিতে চলেন রাজা!

কৃষকের ছেলে

এক যে ছিল কৃষকের ছেলে, তার বাবা ও মা কেউ বেঁচে ছিল না, কাজেই অতি শৈশবে একটা কাজের জোগাড় করতে তাকে বেরুতে হল। সে কত দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াল কিন্তু কোথাও তার কোন কাজ জুটলোনা। একদিন সে বেড়াতে বেড়াতে

ঘরের দোরে বসেছিল এক বুড়ো

এক গভীর বনের মধ্যে এসে পড়ল। সে এক ভীষণ বন। দিনের বেলায়ও সেথায় সূর্য্যের আলো প্রবেশ করেনা। গাছের ছায়ায় ঢাকা অন্ধকার বনপথ দিয়ে যেতে যেতে সে এসে পড়লো একটা ছোট কুঁড়ে ঘরের কাছে! ---কুঁড়ে ঘরটা ছিল কতকগুলি শাখা-প্রশাখায় ঢাকা ঘন পাতার আড়ালে লুকানো বনের ভিতর। সে ঘরের দোরে বসেছিল এক বুড়ো। সে ছিল অন্ধ। চোখের যায়গায় ছিল দুটো খালি কোটর। কুঁড়ে ঘরের পাশে একটা খোঁয়াড়ের মধ্যে ছিল কতকগুলো গরু-ভেড়া। তারা ক্ষুধার জ্বালায় চেঁচাচ্ছিল। ---বুড়ো আপন মনে বলছিল: বাছাধনেরা তোমাদের ক্ষিধে পেয়েছে। আমিত বাপু তোমাদের চরিয়ে আনতে চাই কিন্তু কি করব আমি অন্ধ মানুষ। আর এমন কেউ নেই যে তাকে বলব তোদের চরিয়ে আনতে।

ছেলেটি বললে, দাদুভাই আপনি যদি আমাকে এখানে রাখেন আর পশুগুলো চরাতে দেন, তাহলে আমি এখানেই থেকে যাই। বুড়ো চমকে উঠে বললে; কে বাপু তুমি? তোমার নাম কি? কি করে এলে এখানে? ভারি মিষ্টি কথাত তোমার।

ছেলেটি তখন তার দুর্দ্দশার কথা বুড়োর কাছে বলল। সবাই ওকে রাম বলে ডাকে সে কথাও তাঁকে জানিয়ে দিল। বুড়ো বললে—তা ভাই বেশ কথা, আমি তোমাকে রাখলুম, সকলের আগে গরু-ভেড়াগুলোকে চরিয়ে নিয়ে এস, কিন্তু সাবধান বনের বাইরে যে পাহাড়টা আছে সেখানে এদের নিয়ে যেওনা। সেখানে দুষ্ট পরীরা সব ঘুরে বেড়ায়, তাদের ছলনায় পড়ে মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে তাদের চোখ উপড়ে নেয় ওরা। দেখেছত আমার দুর্দ্দশা।

রাম বুড়োর কথামত—গোরুর পাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল এবং দু'তিন দিন বুড়োর কথামতো বনের ভিতর কাছাকাছি তাদের চরিয়ে নিয়ে এল। এ-ভাবে বেশ আরামে তার দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু একদিন সে মনে মনে ভাবল ভারী ত ভয়? যা হয় হবে। পরীরা আমার কি আর করবে! এই না ভেবে সেদিন সে পশুগুলোকে বরাবর নিয়ে গেল বনের বাইরে সেই পাহাড়ের উপর। সেই পাহাড়ের উপরকার সবুজ ঘাস দেখে পশুর পাল পালে-পালে এদিকে ওদিকে চরে বেড়াতে লাগল মহা আনন্দে। আর রাম চুপ

করে একটা বড় গাছের নীচে ছায়ার তলে ছড়ানো পাথরের উপর চুপ করে বসে রইল। বসবার খানিক পরে কি করে যে এমন আশ্চর্য্য কান্ড ঘটল সে তা জানতে পারেনি। সে দেখতে পেল তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটি সুন্দরী মেয়ে. তার সারা গায়ে সাদা পোষাক। চোখ দুটি তার হরিণের চোখের মত কালো. মাথায় ভরা চুল. ঠিক যেন দাঁড়কাকের গায়ের রঙ। মেয়েটি হেসে বললে—ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন। জান আমাদের বাগানে খুব ভাল আপেল ফল ফলে. আমি তোমার জন্য একটা নিয়ে এসেছি একবার খেয়েই দেখ না। এই না বলে গোলাপ ফুলের মত রাঙা আপেল ফলটি রামকে

হাতে ছিল টুক-টুকে লাল গোলাপ ফুল

নেওয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলে। রাম বুঝতে পারল যদি সে আপেল ফলটী খেয়ে ফেলে তবেই সে ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুমিয়ে পড়লে পর এই সুন্দরী মেয়েটী ছদ্মবেশী দুষ্টু পরী কিনা অমনি তার চোখ উপড়ে ফেলবে। তাই সে মিষ্টি করে বললে—তুমি ভাই আমাকে যে আপেল ফলটি দিতে চেয়েছ তার জন্য অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু জান আমার মনিবের বাগানে মস্তবড় একটা আপেল গাছ আছে......তাতে এত আপেল ফলে যে আমরা খেয়ে কুলোতেই পারিনা। আর সে ফল কি চমৎকার!

রামের কথা শুনে মেয়েটী বললে তবে থাক ভাই। তারপর অভিমানের সুরে বললে—আমি ত তোমাকে জোর করে খাওয়াতে আসিনি। এ-কথা বলে মেয়েটী কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

খানিক পরে আবার আগের মেয়ের চেয়েও সুন্দরী আর একটি মেয়ে এল, তার হাতে ছিল টকটকে লাল একটি সুন্দর গোলাপ ফুল। মেয়েটী এসে বললে—দেখেছ ভাই, কি চমৎকার গোলাপ আর কি মিষ্টি গন্ধ, দেখনা একবার শুঁকে।

রাম উত্তর করল, জান ভাই, আমার মনিবের বাগানে তোমার এই গোলাপের চেয়েও ঢের ঢের সুন্দর ও সুগন্ধি গোলাপ ফুল আছে। আজ আমি আসবার সময় বিশটা গোলাপের গন্ধ শুঁকে এসেছি। কাজেই তোমার ও গোলাপের গন্ধ শুঁকবার আমার কোন প্রয়োজন নেই। মেয়েটি গেল খুব রেগে—সে যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে এল আর একটি মেয়ে দ্বিতীয় মেয়েটির চেয়েও ঢের বেশী সুন্দরী। সে হেসে বললে; রাখাল ভাই, ধন্যবাদ। তুমি বড় ভাল মানুষ। রাম তেমনি জবাব দিলে, বললে: আপনাকেও ধন্যবাদ। আপনি পরমাসুন্দরী। তারপর মেয়েটি রামের মাথার দিকে চেয়ে বললে, সবইত ভাই তোমার ভালো, কিন্তু তোমার চুল-গুলো যেন কাকের বাসা। দেবো একবার চুলটা আঁচড়ে। আমার সঙ্গে কেমন সুন্দর চিরুণী আছে। রাম কোন কথা কইলে না। মেয়েটি যেমন তার চুল আঁচড়াবার জন্য কাছে এল তখন সে মাথার টুপি খুলে পাকান দড়ি আর গুলেল যা সে টুপির ভিতর লুকিয়ে

এনেছিল—দড়ি বের করে মেয়েটীর হাত পা খুব শক্ত করে বেঁধে ফেলল।

মেয়েটী ভয়ানক কাঁদতে লাগল। চীৎকার করে বলতে লাগল, ওগো! কে কোথায় আছ আমাকে বাঁচাও। তার কান্না ও চীৎকার শুনে আগের সেই মেয়ে দু'টী তার সাহায্যের জন্য ছুটে এল। তারা এসে বললে,—ভাই রাখাল বন্ধু তুমি আমাদের বোনকে কেন বেঁধে রেখেছ? তার বাঁধন খুলে দাও।

রাম বলিল, সে আমি পারবনা তোমরা গিয়ে খুলে দাওনা।

মেয়ে দুটী যখন দেখলে, রাম কিছুতেই বাঁধন খুলবেনা, তখন তারা দুজনে বোনটীকে বন্ধন মুক্ত করতে অগ্রসর হল। যেমন তারা এল বাঁধন খুলতে, অমনি রাম তার টুপী থেকে গুলেলটী বের করে দুজনের হাতে গুলি ছুঁড়ে মারল। তারপর এই দু'জনারও হাত পা খুব শক্ত করে বেঁধে ফেলল ও বললে, দুষ্টু পরীরা সব, তোমরা আমার মনিবের চোখ উপড়ে দিয়েছ অন্ধ করে।

ঐ মেয়ে তিনটীকে বেঁধে রেখে রাম ছুটে এল তার মনিবের কাছে, এবং বললে, দেখুন আপনার চোখ যারা উপড়ে ফেলেছিল সেই পরীদের আমি বেঁধে রেখে এসেছি, চলুনত একবার আমার সাথে।

রাম অন্ধ বুড়োকে হাত ধরে নিয়ে এল পাহাড়ের উপর। এসেই যে প্রথম মেয়েটীকে বললে, আমার মনিবের চোখ কোথায় রেখেছ শিগ্‌গির এনে দাও। নইলে তোমাকে ফেলে দেব পাহাড়ের নীচ দিয়ে যে অই নদী বয়ে যাচ্ছে তার বুকে। মেয়েটি প্রথমে বললে, আমিত কিছু জানিনা। কিন্তু রামও নাছোড়বান্দা। সে তখন মেয়েটীকে ধরে নিয়ে চলল পাহাড় থেকে ফেলে দেবার জন্য। তখন সে নিরুপায় হয়ে রামকে নিয়ে একটা গুহার ভিতর গেল। কি আশ্চর্য্য। সে গুহার ভিতর রয়েছে রাশি রাশি চোখ। কত রকমের চোখ যে রয়েছে তার অবধি নেই। কোনটী বড়, কোনটী ছোট। সেখান থেকে দুটো চোখ নিয়ে এসে বুড়োর চোখের কোটরে পরিয়ে দেওয়া হল। বুড়ো কেঁদে বললেঃ একি! এ চোখত আমার নয়। এ চোখ পেঁচার। আমিত কেবল পেঁচাই দেখছি। রাম চোখ দুটো ফেলে দিয়ে সেই দুষ্ট পরীটাকে পাহাড়ের নীচের নদীর বুকে গড়িয়ে ফেলে দিলে।

দ্বিতীয় মেয়েটীকে নিয়ে আবার গেল সে গুহার ভিতর। সে যে চোখ দিল সে চোখ পরিয়ে দিলে পর বুড়ো আবার চেঁচিয়ে বললে—এ যে নেকড়ে বাঘের চোখ। আমি ত কেবল নেকড়ে বাঘ দেখছি।

রাম ভয়ানক রেগে দ্বিতীয় পরীটাকেও নদীর জলে ফেলে দিল। এবার তৃতীয় পরীর পালা। সে যে চোখ দুটো দিলে বুড়ো সে দুটো পরে চেঁচিয়ে বললে—একি। এত বাঁদরের চোখ দেখছি, আমি যে সারা দুনিয়া ভরা শুধু বাঁদরই দেখছি। এইবার রাম যেমন ঐ পরীকে জলের ভেতর ফেলতে যাবে তখন সে কেঁদে অনুনয় করে বললে,—আমায় মেরোনা, আমি বুড়োর সত্যকার চোখ দুটী বের করে দিচ্ছি। এইবার বুড়োকে যেমন চোখ দুটী পরিয়ে দেওয়া হল তখন সে আনন্দে চীৎকার করে বললে—এই আমার চোখ। ঈশ্বরের দয়ায় আবার আমি দুনিয়ার আলো দেখতে পাচ্ছি।

তারপর কি হল শুনতে চাও? রাম মনের আনন্দে চরাত গোরু-ভেড়ার পাল। সে আর তার দাদু বুড়ো থাকতো সেই বনের ভিতর। বুড়ো রান্না-বান্না করত, ক্ষীরসর নবনী তৈরী করতো। দু'জনার দিন বেশ আরামে কাটতে লাগল।

এক যে ছিল মালিনী

এক যে ছিল মালিনী। তার ছিল এক ফুলের গাছ। তার ফুলের গাছে ফুল ফুটত না। তার মনে হল বড় দুঃখ। সে একদিন ফুলগাছকে ডেকে বললে, ও ভাই ফুলগাছ, তোমার গাছে কেন ফুল ফোটে না?

ফুলগাছ বললে—কেমন করে ফুল হবে? তোমার গরু যে আমার কচি কোমল সবুজ পাতাগুলো খেয়ে যায়? তাইতে আমি ফুল ফোটাতে পারিনা।

মালিনী ছুটে গেল গোয়াল ঘরে। সে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে গাভীকে—লক্ষ্মীমণি গাই আমার, তুমি কেন আমার ফুলগাছের সব কচিপাতা খেয়ে ফেল?

গাই বললে—ভারীত আমার দোষ, রাখাল কেন আমায় ভাল করে খেতে দেয় না?

মালিনী—রাখাল ভাই! রাখাল ভাই! কেন তুমি ভাল করে গাইকে খেতে দাও না?

রাখাল—কেন আমায় তোমার রাঁধুনী পেটভরে ভাত খেতে দেয়না? তাইত আমি তোমার গোরুকে ভাল করে সেবা করতে পারিনা।

মালিনী—শুনছ রাঁধুনীদিদি, তুমি রাখালকে কেন পেটভরে খেতে দাও না?

রাঁধুনী—কেমন করে দেব বল? কাঠুরে কেন আমায় কাঠ জোগায় না?

মালিনী—কাঠুরে ভাই, কাঠুরে ভাই, রাঁধুনীকে কেন কাঠ দাও না?

কাঠুরে—কামার কেন আমায় কুড়োল দেয় না?

মালিনী—কামার ভাই, কামার ভাই, তুমি কাঠুরেকে কেন কুড়োল দাও না?

কামার—আমি লোহার গুঁড়ো কোথায় পাব? লোহার মহাজন কেন আমায় লোহার গুঁড়ো দেয়না?

মালিনী—শুনছ ভাই লোহার মহাজন, তুমি কেন কামারকে লোহার গুঁড়ো দাও না?

লোহার মহাজন—মেঘ কেন বৃষ্টি করে? তাইত আমার হাপরের আগুন যায় নিবে।

মালিনী—ও ভাই আকাশের মেঘ, তুমি কেন বৃষ্টি নামাও?

খুব ডাকবো ঘাঙর ঘাঙু

মেঘ—ব্যাঙ কেন ঘ্যাঙ্গর্ ঘ্যাঙ্গর্ করে ডাকে? তাইত আমি বৃষ্টি নামাই।

মালিনী—ব্যাঙ ভাই, ব্যাঙ ভাই! তুমি কেন ঘ্যাঙ্গর্ ঘ্যাঙ্গর্ করে ডাক? তাইত বৃষ্টি আসে হেনে।

ব্যাঙ—হুঃ। আমার দাদার দাদার ঠাকুর্দা—তারও দাদা—ঠাকুর্দারা সব বরাবর ডেকে বর্ষা আনেন আর আমি বুঝি ডাকব না। আমি কি চৌদ্দপুরুষের অভ্যাস ছেড়ে দিতে পারি? খুব ডাকবো—ঘ্যাঙ্গর্ ঘ্যাঙ্গর্—ঘ্যাঙ্গর্ খুব ডাকবো—খুব ডাক্‌বো!

মণির গুণ

ব্রহ্মদত্ত যখন কাশীর রাজা, সে-সময়ে কাশীরাজ্যের চারিজন ব্রাহ্মণ-কুমার সন্ন্যাসী হইয়া হিমালয়ে গমন করেন। হিমালয়ের চূড়ায় একটি নিভৃত স্থানে সেই চারিজন সমান—দূরে দূরে চারিটি ছোট কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন। কিছুদিন পরে বড় ভাইটি মারা গেলেন। তখন অপর তিনজন হিমালয়ের বুকেই ধ্যান-ধারণা করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন।

অনেক দিন যায়। পর্ব্বতের নীচে যে-ছোট গ্রামটি ছিল, সেখানকার একজন লোক একদিন পর্ব্বতের এদিকে ওদিকে বেড়াইতে বেড়াইতে অবশেষে সেই সাধুদের আশ্রমের কাছে গিয়া উপস্থিত হইল, সেই সুন্দর নির্জ্জন স্থানে আশ্রমটি দেখিয়া তাহার মন সাধুদের সেবার জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে-লোকটির নাম ছিল শঙ্ক।

শঙ্ক প্রথমে সাধুদের মধ্যে যিনি বয়সে বড় সেই তপস্বীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল: প্রভু! আপনার কি কোন কিছুর দরকার আছে? আমি আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত আছি।

তপস্বী তখন পান্ডুরোগে ভুগিতেছিলেন, তিনি বলিলেন: বাপু, যদি আমার সেবাই করিতে চাও, তবে আমার আগুনের প্রয়োজন, আগুণ জ্বালবার ব্যবস্থা করে দেও। শঙ্ক, তাঁহাকে একটি কুড়াল দিয়া বলিল—প্রভু, যখনই আপনার আগুণের দরকার হইবে: তখন এই কুড়ালটিকে বলিবেন—কুড়াল, যাও ত আমার জন্য কাঠ আন তখনই কুড়ালটি কাঠ কেটে এনে আপনার জন্য আগুণ জ্বালিয়া দিবে!

এইরূপ বলিয়া শঙ্ক প্রথম তাপসকে কুড়ালখানি দিয়া অন্য তপস্বীর নিকট গেল।

দ্বিতীয় সাধু, নিজ কুটীরের সম্মুখে বসিয়াছিলেন। শঙ্ক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমি কি আপনার কোন উপকার করতে পারি? সেই সাধুর আশ্রমের কাছে বন্য হস্তি-কুল

যাতায়াতের পথ করিয়া লইয়াছিল। তাহাদের অত্যাচারে সাধু একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাই তিনি বলিলেন দেখ বাপু, যদি আমার উপকার কিছু করতে চাও, তা হ'লে এই হাতীর দল তাড়িয়ে দেও।

শঙ্ক তাঁহাকে একটি জয়ঢাক দিয়ে বলিল—যদি ঢাকটির ডানদিকে আওয়াজ করেন তা হলে হাতীগুলি শব্দ শুনবা মাত্র পালিয়ে যাবে, আর যদি বাঁদিকে শব্দ করেন, তবে হস্তি-কুল আপনার পোষ মানবে, এবং আপনার কুটীরের চারদিক ঘিরে থেকে আপনাকে রক্ষা করবে। এই কথা বলিয়া শঙ্ক সাধুকে জয়ঢাকটি দিয়া চলিয়া গেল।

তৃতীয় তপস্বীর কাছে গিয়া তাঁহার কোন কিছুর দরকার আছে কিনা, সে কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—বাপু, আমার কিছু দুধের দরকার আর কিছুই নয়।

শঙ্ক তাঁহাকে একটি দুধের বাটি দিয়া বলিলেন—প্রভু! আপনি এই বাটিটাকে রেখে দিন; বাটিটাকে উপুড় করে যখন যা চাইবেন, তাই পাবেন। এই বাটি আপনাকে যত দুধ, দধি ক্ষীর ননী, সর সংগ্রহ করে দিবে। এইরূপে সেবাপরায়ণ শঙ্ক সেই তিন সাধুর অভাব মিটাইয়া গ্রামে ফিরিয়া গেল, সাধুদেরও অভাব রহিল না,—কুড়াল আগুণ জোগায়, জয়ঢাক হাতী তাড়ায়, আর দুধের বাটি দুধের নদী বহাইয়া দেয়।

তারপর এক আশ্চর্য্য কথা। কাছাকাছি কোন একটা পোড়ো গ্রাম—সেই গ্রামের লোকেরা একবার একটা মহামারীতে মরিয়া গিয়াছিল, সেইখানে একটা বুনো শূকর চরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এক অদ্ভুত মণি পাইল, যখন সে ঐ মণিমুখে করিত, তখন সে আকাশে উড়িতে পারিত, এই ভাবে উড়িতে উড়িতে সে একদিন একটি দ্বীপে নামিল। দ্বীপের চারিদিক ঘিরিয়া মহাসমুদ্র, দিন নাই রাত্রি নাই অনবরত ভয়ংকর শব্দে সমুদ্রের ঢেউ দ্বীপের গায়ে আছড়াইয়া পড়ে।

শূকরটির কাছে মহাসমুদ্রে ঘেরা এই দ্বীপটি খুবই ভাল লাগিল। সেখানে একটি আম গাছের নীচে সে বেশ আরামে বাস

করিতে লাগিল। একদিন মাথার কাছে মণিটি রাখিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

সে-সময়ে কাশীর একজন দুর্দ্দান্ত লোককে তাহার মাতাপিতা বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। নির্ব্বাসিত লোকটি বন্দর হইতে একটা জাহাজে চড়িয়া অজানার সন্ধানে যাত্রা করিল। দৈবের দুর্ঘটনা ভীষণ ঝড়ে পড়িয়া সমুদ্রে ঐ জাহাজ ডুবিয়া গেল। বেচারা জাহাজের একখানা কাঠ ধরিয়া ভাসিতে ভাসিতে শূকরটি যে-দ্বীপে আশ্রয় লইয়াছিল সেই দ্বীপে গিয়া পৌঁছিল, ক্ষুধায় তখন তাহার পেট জ্বলিতেছিল, হতভাগ্য ব্যক্তি, কোথাও কোন গাছে ফল মিলে কিনা তাহা খোঁজ করিতে করিতে যেখানে আম গাছের তলায় শূকর ঘুমাইতেছিল, সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল এবং দেখিতে

শূকরটা আঘাত খাইয়া জাগিয়া উঠিল...

পাইল যে লাল টুক্‌টুকে একটি ফল সেখানে পড়িয়া আছে! কি সুন্দর ফলটি! সে তাড়াতাড়ি ফল ভাবিয়া যেমন মণিটি মুখে দিল অমনি ঝড়ের মত বেগে আকাশে উঠিতে লাগিল। সে কোন রকমে ঐ আম গাছটার উপর নামিয়া সেখানকার একটা উচু

ডালের উপর বসিয়া ভাবিতে লাগিল—নিশ্চয়ই শূকরটি এই মণি মুখে করিয়াই আকাশে উড়িয়া এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

লোকটি ভাবিল, এখন শূকরটাকে না মারিলে আর উপায় নাই! সে এইরূপ ভাবিয়া ঘুমন্ত শূকরটার মাথার উপর একটা ডাল ছুঁড়িয়া মারিল। শূকরটা আঘাত পাইয়া জাগিয়া উঠিয়া যখন দেখিতে পাইল যে, তাহার মণিটি নাই, তখন সে ক্ষেপিয়া উঠিল এবং গাছের গোড়ায় মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে মরিয়া গেল। শূকরটিকে মরিতে দেখিয়া লোকটির মুখে হাসি আর ধরে না, সে পরমানন্দে মণি মুখে করিয়া এদিক্ ওদিক্ বেড়াইয়া ফলমূল আহরণ করিয়া পেট পুরিয়া খাইল এবং মণি মুখে করিয়াই আবার ভারতবর্ষের দিকে উড়িয়া চলিল।

সে যখন হিমালয় পর্ব্বতের শিখরগুলির উপর দিয়া যাইতেছিল, তখন সেই তিন মুনির আশ্রমের কাছে নামিয়া বাস করিতে লাগিল। সেখানে দুই তিন দিন থাকিয়াই সে কুড়ালি, জয়ঢাক, আর দুধের বাটিটির আশ্চর্য্য গুণের কথা জানিতে পারিল। তখন সে পণ করিল ঐ তিনটি জিনিস সে যে ভাবেই হউক মুনিদের কাছ হইতে লইতে হইবে।

একদিন সে প্রথম মুনির কাছে গিয়া বলিল—প্রভু! এই যে মণিটি দেখছেন, এই মণির ক্ষমতা বড় অদ্ভুত! এই মণিটি মুখে রাখলে আকাশ পথে ভ্রমণ করা যায়! —চমৎকার নয় কি?

তাপসের মনে আকাশে বেড়াইবার ইচ্ছাটা খুবই ছিল, তিনি কুড়ালটির বদলে লোকটার কাছ হইতে মণিটি লইলেন। এদিকে ঐ লোকটা কুড়ালিটি পাইয়া জঙ্গলের ভিতর গিয়া বলিল—কুড়ালি, মুনির মাথা কেটে আবার মণি এনে দাও। যেমন বলা, অমনি কুড়ালি মুনির মাথা কাটিয়া, মণিটি আনিয়া তাহার হাতে দিল। তখন সে কুড়ালিটি জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া আসিল দ্বিতীয় তপস্বীর কাছে।

ঐরূপ কৌশল করিয়া দ্বিতীয় মুনির মাথা কাটিয়া ফেলিয়া তাহার জয়ঢাকটি সে লইয়া আসিল।

তারপর সে গেল তৃতীয় তাপসের কাছে; দুধের বাটিটার গুণা গুণ জানিতেও তাহার বাকী ছিল না, কাজেই ঠিক্ ঐ ভাবে আকাশে

বেড়াইবার লোভ দেখাইয়া—সে মণির বদলে ঐ মুনির নিকট হইতে দুধের বাটিটা হাত করিল। অবশেষে অন্য দুইজন মুনিকে যেমন ভাবে কুড়ালি দিয়া মারিয়া মণি ফিরিয়া পাইয়াছিল, এইবার ও তাহাই করিল।

এই ভাবে নানা দুলর্ভ জিনিস হস্তগত করিয়া সে শূন্য পথে কাশী চলিয়া গেল।

কুড়াল দিয়া মুনির মাথা কাটিয়া ফেলিল

দেবধর্ম্ম কাকে বলে

— এক —

অতি প্রাচীন কালে বারাণসী রাজ্যে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। রাজার ছিল দুই রাণী। বড় রাণীর দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ অহিংসকুমার, কনিষ্ঠের নাম চন্দ্রকুমার। চন্দ্রকুমার যখন বড় হইয়াছেন, হাঁটিতে ছুটিতে পারেন সে-সময়ে বড় রাণীর মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরে ছোট রাণীর হইল এক পুত্র। রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। রাজ্যে মহা উৎসব করিলেন এবং ছোট রাণীকে কহিলেন: রাণী তুমি তোমার পুত্র সূর্য্যকুমারের জন্য আমার কাছে যে বর চাইবে, আমি সে বর তোমাকে দিব, বল তুমি কি চাও? রাণী কহিলেন: মহারাজ! এখন আমার বর নেওয়ার প্রয়োজন নাই, যখন নেওয়ার আবশ্যক হইবে, তখন আপনার কাছে —সে বর চাইব।

ক্রমে সূর্য্যকুমারের যখন উপযুক্ত বয়স হইল, তখন ছোটরাণী রাজার কাছে বলিলেন,—মহারাজ! সূর্য্যকুমার জন্ম লাভ করবার পর, আমাকে বর দিতে চেয়েছিলেন, এইবার সে বর দিন।

বল তুমি আমার কাছে কি বর চাও?

আপনি সূর্য্যকুমারকে এ-রাজ্যের যুবরাজ করুন।

অসম্ভব বর চাইছ রাণী, আমার দুই পুত্র অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, আমি তাদের ছেড়ে কেমন করে তোমার ছেলেকে রাজ্য দিবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারি? সেত হয়না?—বলিলেন রাজা।

রাণী রাজার এই কথায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বিষণ্ণ মনে থাকিতেন এবং সর্ব্বদা রাজাকে বলিতেন—আপনি পরম অধর্মচারী! যে রাজা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনা, সে কি রাজার যোগ্য? ধিক্ সে......সে যে—কাপুরুষ।

রাণীর ব্যবহারে রাজা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন!

একদিন রাজা তাঁহার জ্যেষ্ঠ দুই পুত্রকে গোপনে ডাকিয়া কহিলেন: শোন তোমরা, যখন তোমাদের ছোট ভাই সূর্য্যকুমারের জন্ম হয়, তখন আমি তোমাদের বিমাতাকে একটি বর দিতে চেয়েছিলাম। তখন তিনি সে বর নেন নি এখন তিনি আমার কাছে সে বর চাইছেন।

কি বর বাবা? দুই ভাই উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন;—তোমাদের বিমাতা, আমার কাছে বর চেয়েছেন সূর্য্যকুমারকে যুবরাজের পদ দিতে, ভাবী রাজার আসনে বসাবার জন্য আমার কাছে চান প্রতিশ্রুতি। আমার মনে হয় রাণী কোনরূপ গোপন ষড়যন্ত্র করে তোমাদের সব্বর্নাশ করতে পারেন, তাই আমার আদেশ মেনে নিয়ে তোমরা নিবিড় বনে গিয়ে আশ্রয়লাভ কর। পরে আমার মৃত্যুর পর শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে, এ-রাজ্য হবে তোমাদেরই প্রাপ্য, তখন তোমরা এসে সিংহাসন গ্রহণ করো।

অহিংসকুমার ও চন্দ্রকুমার দুই ভাই রাজার চরণে প্রণাম ও বন্দনা করিয়া চলিলেন বনের দিকে। রাজা পুত্রদের ললাটে ও মস্তকে স্নেহ-চুম্বন করিয়া তাহাদের দিলেন বনে পাঠাইয়া। রাজার চোখ দিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল।

অহিংসকুমার ও চন্দ্রকুমার যখন রাজপুরী হইতে বাহির হইয়াছেন, সে-সময়ে সূর্য্যকুমার রাজপ্রাসাদের বাহিরের প্রাঙ্গণের মধ্যে খেলা করিতেছিল। সে বড় ভাইদের বাহিরের দিকে যেতে দেখে জিজ্ঞাসা করিল—দাদারা তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

তাঁরা উত্তর দিল আমরা বনে বেড়াতে যাচ্ছি। কেন তারা বনে যাচ্ছে, সেকথা বললোনা। সব কথা জানিতে পারিয়াও সূর্য্যকুমার কাহারও বাধা না মানিয়া তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। এইরূপে তিনভাই একসঙ্গে বনে গমন করিলেন। সূর্য্যকুমার মাতাও পিতার বাধা মানিলেন না। —রাণী আশ্চর্য্য হইলেন।

— দুই —

এদিকে তিন রাজপুত্র নানা দেশ-বিদেশ পর্য্যটনের পর অবশেষে তাঁহারা হিমালয় পব্বর্তের এক নিজ্জর্ন প্রদেশে আসিলেন। সুন্দর সে নিভৃত স্থান। চারিদিকে নীল পব্বর্ত শ্রেণী মাথা তুলিয়া

দাঁড়াইয়া আছে। ফুলে ফুলে-ফলে ফলে সে বনের শোভা......যেন উপবন। তাঁহারা যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখান হইতে দেখা যাইতেছিল অদূরে এক সরোবর। সরোবরের নির্ম্মল জল বাতাসে দুলিতেছে—ছোট ছোট ঢেউ নাচিতেছে—জল ফটিকের মত স্বচ্ছ, তিন ভাই একটি বিশাল তরুতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমন সময় ছোট ভাই সূর্য্যকুমার বলিলেন—দাদা, আমার বড় পিপাসা পেয়েছে।

উদক প্রশ্ন করিল : বল দেখি দেবধর্ম কি?

বড় রাজকুমার বলিলেন—ঐ সরোবরের জলে স্নান করে জল পান করে এসো। আসবার সময় গাছের পাতায় করে আমাদের জন্য ও জল নিয়ে আসতে ভুলোনা।

—ঐ যে সরোবর, পূর্ব্বে ছিল কুবের রাজার। তিনি উহা উদক নামক এক রাক্ষসকে দান করিয়া বলিয়াছিলেন—শোন উদক, দেবধর্ম্ম জ্ঞানবিহীন কোন ব্যক্তি যদি এই সরোবরের জলে নামে, তবে সে হবে তোমার ভক্ষ্য কিন্তু যারা জলে নামবেনা, তাদের ওপর তোমার কোন অধিকার থাকবেনা।

—যে কেহ ঐ সরোবরের জল পান করিতে জলে নামিত, অমনি উদক রাক্ষস, সরোবরের গভীর তলদেশ হইতে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার কাছে আসিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিত—বল দেখি দেবধর্ম্ম কি?

সূর্য্যকুমারত এসব কোনকথা জানিতনা। সে নিঃশঙ্ক মনে সরোবরের জলে নামিবা মাত্রই উদক রাক্ষস আসিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিল—বল দেখি দেবধর্ম্ম কি?

সেকি আর জানিনা? লোকে সূর্য্য ও চন্দ্রকে দেবতা বলে। তাদের পূজা করাই হচ্চে দেবধর্ম্ম। তাহার কথায় উদক রাক্ষস হা হা করিয়া অট্টহাসি হাসিয়া কহিল:—মিথ্যে কথা, দেবধর্ম্ম কি তুমি তাও জাননা!

তখন রাক্ষস পলকমধ্যে সূর্য্যকুমারকে লইয়া গভীর জলমধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাহাকে জলের নীচে জলপুরীতে বন্দী করিয়া রাখিল।

সূর্য্যকুমারের ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া তাহার সন্ধানে গেল চন্দ্রকুমার। রাক্ষস চন্দ্রকুমারকে ও ধরিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বল দেখি—দেবধর্ম্ম কি? চন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিল—সেকি আর আমি জানিনা? চার দিক্ দিয়াই হচ্চে দেবধর্ম্ম।

রাক্ষস আগেরি মত হাসিয়া কহিল!—মিথ্যেকথা। তুমি দেবধর্ম্ম জাননা। একথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে রাক্ষস তাহাকে লইয়া অতল জল তলে চলিয়া গেল।

— তিন —

সূর্য্যকুমার ও চন্দ্রকুমার এই দুই ভাইয়ের ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া বড় রাজকুমার অহিংসকুমার তরবারি খুলিয়া লইয়া এবং ধনুর্ব্বাণ হাতে করিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়াও তাহাদের খোঁজ পাইলনা, কিন্তু পদচিহ্ন দেখিয়া বুঝিলেন তাঁহারা দুইজনেই সরোবরের জলে নামিয়াছিল। তখন তাহার মনে সন্দেহ হইল, এই সরোবরে নিশ্চয়ই উদক রাক্ষস আছে।

এদিকে উদক রাক্ষস দেখিল বড় রাজকুমার জলে নামিতেছেনা। তখন সেই মায়াবী রাক্ষস বনচরের বেশে আসিয়া তাহাকে কহিল—আপনি পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছেন দেখছি। এই সরোবরের স্বচ্ছ শীতল জলে অবগাহন করে শান্তিলাভ করুন, এবং তার পর পদ্মের মৃণাল ও জলপান করুন। তাহলে শরীর শীতল হবে এবং আপনার পথ চলতেও কোন ক্লেশ হবেনা।

রাজকুমার বনচর বেশী রাক্ষসকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কহিলেন আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। তুমি উদক রাক্ষস। তুমিই কি আমার ভাইদের বন্দী করে রেখেছ?

উদক কহিল—হাঁ।

কেন বন্দী করে রাখলে?

কেন? তারা যে আমার ভক্ষ্য।

না—না তা কেন হবে।

তবে?

যারা দেবধর্ম্ম জানে তারাই শুধু আমার ভক্ষ্য নয়।

বুঝেছি। তুমি দেবধর্ম্ম কি তা আমার কাছে জানতে চাও?

হ্যাঁ।

তবে দেবধর্ম্ম কি শোন। কিন্তু রাক্ষস, আমি এখন পথশ্রমে বড় ক্লান্ত।

একটু বিশ্রাম করি, শ্রান্তি দূর করি......তারপর তোমাকে বলবো।

তখন রাক্ষস বড় রাজকুমারকে সরোবরের জলে স্নান করাইয়া—খাদ্য ও পানীয় জল দিল এবং তাঁহাকে অতি সুন্দর ভাবে পদ্মফুল দিয়া সাজাইল, গন্ধদ্রব্য দ্বারা তাহার দেহ অনুলিপ্ত করিল এবং তাঁহার

শয়নের নিমিত্ত এক বিচিত্র মন্ডপের মধ্যে স্থাপন করিল সুবর্ণ পালঙ্ক।

পর উপকারে যাঁর অহিংস হৃদয়
দেবধর্ম্ম বলে তারে জানিয়ো নিশ্চয়

রাজকুমার তাহাতে পরম শান্তিতে উপবেশন করিলেন। তখন রাক্ষস তাঁহার পদতলে বসিলে, রাজকুমার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া—দেবধর্ম্ম কি সে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শোন তবে—উদক:

শান্তি মনে চলে সদা, ভুলেও স্মরণে
পাপ চিন্তা নাহি করে আপনার মনে।
পর উপকারে যাঁর অহিংস হৃদয়,
দেবধর্ম্ম বলে তারে জানিয়ো নিশ্চয়।

রাক্ষস রাজকুমারের কাছে দেবধর্ম্মর এই সুন্দর ব্যাখ্যা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিল—আমি তোমার একজন ভাইকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। বল কাকে তুমি চাও?

রাজকুমার কহিলেন—আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সূর্য্যকুমারকে আমি চাই। রাক্ষস হাসিয়া কহিল: রাজকুমার তুমি দেবধর্ম্ম জান বটে কিন্তু......

কেন?

কে কবে আপনার সহোদর ভাইকে ছেড়ে ছোট ভাইকে বাঁচাতে চায়? ইহাতে কি জ্যেষ্ঠের মর্য্যাদা রক্ষা হয়?

তখন রাজকুমার বলিতে লাগিলেন—আমি দেবধর্ম্ম জানি বলেই আমার ছোট ভাইয়ের মুক্তি চেয়েছি। সে আমাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। স্বেচ্ছায় সে আমাদের সঙ্গে বনবাসী হয়েছে। বিমাতা তাকে রাজা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে আমাদের সঙ্গে এসেছে। রাজ্যলোভে গৃহে না থেকে বনবাসে, একদিনও গৃহে ফিরবার কথা সে ভাবে নাই। এখন আমি যদি বলি তাকে রাক্ষসে খেয়েছে, তবে সেকথা কি কেউ বিশ্বাস করবে? লোক গঞ্জনার ভয়েও আমি তার জীবন ভিক্ষা চাইছি।

রাক্ষস রাজপুত্র অহিংসকুমারের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া সাধু! সাধু! ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং বলিল:—রাজকুমার, তুমি বাক্যে ও কার্য্যে একভাবে কাজকর! ধন্য তুমি।

—তারপর রাক্ষস সূর্য্যকুমার ও চন্দ্রকুমার দুই ভাইকে আনিয়া দিল।

রাজকুমার বলিলেন—তুমি পূর্ব্বজন্মে অনেক পাপ কার্য্য করেছ বলে রাক্ষস হয়ে জন্মেছ তাই তুমি অপর প্রাণীর রক্তমাংসে দেহ ধারণ করেছ। এ-পাপের জন্য চিরদিন তোমাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। হিংসা প্রবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে সৎপথে চল, তুমি নিশ্চয়ই মুক্তি পাবে।

রাজকুমারের কাছে এই উপদেশ লাভ করিয়া রাক্ষসের মনের পরিবর্ত্তন হইল। সে ধর্ম্মপথে মন দিল, হিংসা ভুলিল এবং সে পরম যত্নে রাজকুমারদের রক্ষা করিতে লাগিল।

তারপর একদিন সংবাদ আসিল রাজা ব্রহ্মদত্তের মৃত্যু হইয়াছে। তখন রাজকুমারেরা তিন ভাই উদক রাক্ষসকে সহ বারাণসীধামে গমন করিয়া রাজসিংহাসনে বসিলেন। চন্দ্রকুমার হইলেন উপরাজ—মানে রাজপ্রতিনিধি, সূর্য্যকুমার হইলেন সেনাপতি। রাজা উদক রাক্ষসের সবর্ববিধ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার জন্য সুন্দর বাসভবন প্রস্তুত হইল, এবং খাদ্য ও অন্যান্য সুখসুবিধার ও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। রাজ্যের সকলে পরম শান্তিতে বাস করিতে লাগিলেন।
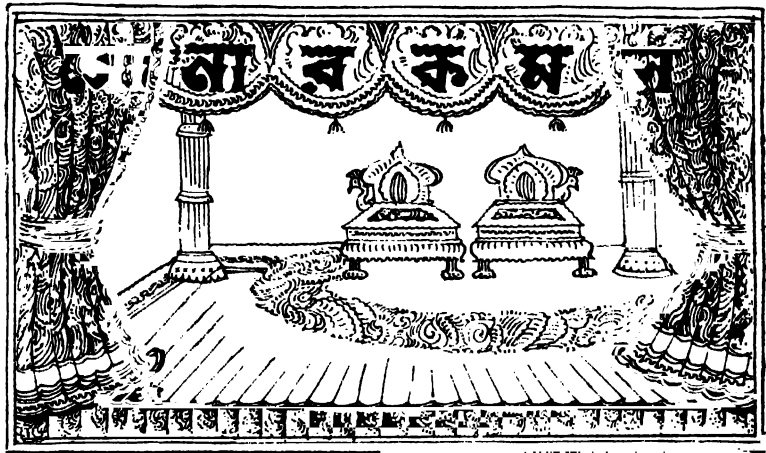
একটি রূপকথার কাহিনীকে নাট্যরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। দশবারো বৎসরের বালকবালিকারা একটি অভিনয় করিতে পারে। এ বয়সের ছেলে-মেয়েদের কাছে রূপকথার স্বপ্নরাজ্যের ছবি একটি অপূর্ব মাধুরী রচনা করিয়া থাকে। তাহাদের কাছে রাজা ও রাণী, রাজকন্যা, যাদুকর, পরী, এসব গল্প আনন্দের ও কৌতূহলের সৃষ্টি করে। এই রূপকথার কাহিনীর মধ্যে একটি সুন্দর উপদেশ আছে। যেখানে দয়া, মায়া, স্নেহ ও ভালবাসা সেখানেই ফুটিয়া উঠে মরুর মধ্য হইতেও সোণার কমল।

রাজা কর্ণদেব	চারিজন সভাসদ
রাজকুমারী কল্যাণী	চারিজন সম্ভ্রান্ত মহিলা
রাজপুত্র জয়ন্ত	দুইজন নকীব (ঘোষণাকারী)
„ বিজয়সিংহ	ছয়জন বনপরী
„ সুবন্ধু	কমলবনের কমল পরী
বিদূষক	রামরাজা (যাদুকর)

এই অভিনয়ে চব্বিশটি ছেলেমেয়ের দরকার। তবে সংখ্যা বাড়ান বা কমান যাইতে পারে। যেমন পরী বা সভাসদ ও সম্ভ্রান্ত মহিলাদের সংখ্যা কমাইলেও কোন ত্রুটি হইবে না।

বিজয়সিংহের ভূমিকা বেশ একটি মোটা ও বেঁটে ছেলেকে দিলে ভাল মানাইবে। রামরাজা যাদুকরের ভূমিকা সবচেয়ে দীর্ঘকায় বালককে দিলে মানাইবে ভাল।

[দৃশ্যপট]—১। রাজার সভা। সিংহাসন দুইখানি। আর পেছনে পর্দ্দা দিলেই চলিতে পারে। ফুলের মালা, পুষ্প-স্তবক, ফল-মিষ্টি ইত্যাদি সাজানো বেশ রুচিসম্মত রূপ করিবে। দ্বিতীয় দৃশ্য—বন ও পাহাড়। দৃশ্যপটে নদী বহিয়া যাইতেছে এইরূপ যেন থাকে। তৃতীয় দৃশ্য—সেই রাজসভা। উৎসব-সজ্জায় সজ্জিত।

স্থান—রূপ-কথার স্বপ্নরাজ্য। সময়—সে অনেক কাল আগের কথা সঙ্গীত ও বাদ্য ইচ্ছানুরূপ বাড়ানো ও কমান যাইতে পারে। তাহা প্রযোজকের ইচ্ছানুরূপে হইবে। গানের সুর সম্বন্ধেও তাহাই।

প্রথম অঙ্ক

[রাজসভা—উচ্চ বেদীর উপর দুইখানি সিংহাসন। চারিজন সভাসদ ও চারিজন সম্ভ্রান্ত মহিলা হাতে হাত ধরিয়া প্রবেশ করিয়া সিংহাসনের চারিদিক বেড়িয়া দাঁড়াইল]।

একজন সভাসদ—আজ এই উৎসব আপনাদের কেমন লাগলো? চমৎকার—কি বলেন?

দ্বিতীয় সভা। [একটি সন্দেশ খাইতে খাইতে] বলেন কি খুব ভাল। এই দেখুন না এখনও সন্দেশটা শেষ করতে পারিনি। সন্দেশ কিন্তু বেশ মিষ্টি হয়!

তৃতীয়। তাইত এ অতি আশ্চর্য্য কথা। অতি খাসা! অতি অপূর্ব্ব,—কি বলেন ভদ্রমহিলারা? কিন্তু এই রসগোল্লায় যেন মিষ্টি একটু কম হয়েছে বলে মনে হয়,—আপনারা কি বলেন? (মেয়েদের দিকে চাহিয়া) আপনারা খেয়ে দেখুন, তবেই বুঝবেন আমি ঠিকই বলেছি। [সকলে হাসিলেন]

প্রথম—মহিলা। রাজকুমারীকে আজ কি সুন্দরই না দেখাচ্ছিল—

দ্বিতীয় মহিলা। সোণালি পোষাকটিতে কি চমৎকারই না মানিয়েছে—কিন্তু—

তৃতীয় মহিলা। কিন্তু ভাই, ফুল কোথায়? সোণালি রংয়ের একটি ফুলের মালা হলে ঠিক মানাত, মনে হত যেন রাজকুমারী আমাদের বসন্তের—রাণী।

চতুর্থ মহিলা। ফুল, সে যে ভাই সোণার কমল। সে কোথায় মিল্‌বে ভাই? সারাদেশ ঘুরে বেড়াও কোথাও তা মিলবে না।

চতুর্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সোণার কমল! সোণার কমল! কি সুন্দর কল্পনা!—কোথায় ফোটে—কে জানে!

[দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন এবং এমন ভাবে কথা কয়টি বলিলেন যে সকলে হাসিতে লাগিলেন]

দুই দিক দিয়া দুইজন—নকীব প্রবেশ করিল। তাহারা বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে প্রবেশ করিল। বাঁশীর সুরে বাজিতেছিল—

এস এস নরবর,
বন্দে তোমায় প্রজাগণ সবে
বন্দিছে চরাচর।
দেশে দেশে তব
মহিমা প্রচারে
পবনে, গগনে দিবাকর।
—এস এস নরবর।

[বাঁশী বাজান শেষ হইলে, দুইজনে সমস্বরে বলিল—রাজা আস্‌ছেন। সঙ্গে আস্‌ছেন রাজকুমারী কল্যাণী দেবী। কথা শেষ হইবার সহিত রাজা একদিক দিয়া এবং রাজকন্যা অন্যদিক দিয়া প্রবেশ করিলেন এবং দুইজনে মধ্যভাগে দাঁড়াইলেন। সকলে তাঁহাদের মাথা নত করিয়া রাজা ও রাজকন্যাকে অভ্যর্থনা করিল, তাহারা দুইজনে পরে সিংহাসনের উপর গিয়া বসিলেন। যেমন তাঁহারা বসিলেন, অমনি বিদূষক দৌড়াইয়া আসিয়া অনুরূপ ভঙ্গী করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—আমি কে জানেন? আমি রাজার বিদূষক?

[বিদূষক রাজকন্যার আসনের নীচে বসিলেন]

রাজা। (দাঁড়াইয়া) শুনুন, রাজ্যের সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণ! শুনুন মাননীয়া মহিলাগন! আমার কন্যার বিবাহের যোগ্য বয়স হয়েছে। আমাদের দেশের নিয়ম অনুসারে, তার জন্য পাত্র নিবর্বাচন করতে হবে! নকীব, তোমরা রাজধানীতে উপস্থিত রাজকুমারদের সভায় আসতে আহ্বান কর।

[ঘোষকেরা বাঁশী বাজাইল। বাঁশীতে বাজিল—

এস এস রাজার কুমার!
এস এস রাজার কুমার!
স্বাগত এ রাজার সভায়!

রাজকুমারেরা একে একে বাঁ-দিক দিয়া প্রবেশ করিলেন।
রাজকুমারগণ (মিলিতকন্ঠে) ধন্য ধন্য মহারাজ! [মাথা নত করিয়া সকলে রাজাকে অভিবাদন করিলেন।]

প্রথম রাজকুমার। আমি কাশ্মীরের যুবরাজ। নাম আমার জয়ন্ত। শ্রীনগরে ঝিলাম নদীর তীরে আমার অপরূপ রাজপ্রাসাদ! সে যেন স্বপ্নপুরী। সে-ভূ-স্বর্গ।

রাজা। আনন্দিত হলেম! (কন্যার দিকে চাহিলেন)।

দ্বিতীয় রাজকুমার। আমার নাম বিজয়কুমার। কলিঙ্গের রাজা। আমার ধন-ভান্ডার-সোণায় ঝলমল করে। এত সোণা—বুঝি পরীদের দেশেও নেই, কুবের ভান্ডারে থাকাও সম্ভবপর নয়!

রাজা। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) বটে!

রাজকুমার বিজয়। হ্যাঁ, মহারাজা! আর আমার যে পাচক—তার তুলনা মেলা ভার! [পেটে হাত বুলাইলেন]

রাজা। বেশ! বেশ! আর তুমি?

তৃতীয় রাজকুমার। আমি, মহারাজ আমি—রাজপুত্র সুবন্ধু! আমি নেহাৎ গরীব মহারাজ! নীল সাগর বেষ্টিত ক্ষুদ্র এক অজানা দ্বীপের রাজা, বলবার মত কিছু নয়!

রাজা। (রাজকুমারী কমলার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন) দেখ্‌ছি তোমাকে পাবার জন্য এরা একটা হাঙ্গামা বাঁধাবে একটা ছোটখাট লড়াই বাঁধাবে! নিশ্চয়!

রাজকুমারী। না বাবা! আমার জন্য কোন যুদ্ধ বাঁধে, তা আমি চাইনে বাবা।

রাজা। (হাসিয়া বলিলেন) ইতিহাস পড়েছ ত? ইতিহাসে যে এমন কথাই বলে আস্‌ছে।

রাজকুমার জয়ন্ত। রাজকুমারী বলুন—আপনার জন্য আমাদের কি করতে হবে?

রাজকুমার বিজয়। আমরা সে কথা শুনবার জন্যই যে উৎসুক হয়ে আছি।

রাজকুমার সুবন্ধু। [কোন কথা বলিলেন না। তিনি রাজকন্যার দিকে চাহিয়াছিলেন, সত্যকথা বলিতে কি রাজকন্যাও রাজ কুমার সুবন্ধুর দিকে অপলকে চাহিয়াছিলেন]।

রাজকুমারী-কল্যাণী। শুনুন, সভার সকলে শুনুন, রাজকুমারগণ! যিনি আমার জন্য সোণার কমল সংগ্রহ করে এনে সে কমলে মালা গেঁথে আমার গলায় মালা পরাতে পারবেন, আমি তারি কণ্ঠে বরণ মালা দিব।

[রাজ-সভার সকলে চমকিত হইলেন। সকলে চুপ চাপ। রাজকন্যার এইরূপ একটা অসম্ভব কথায় আশ্চর্য্য হইলেন এবং পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন]।

রাজা। (মাথা নাড়িতে লাগিলেন। এই ভাব- কন্যা তাহার কি অসম্ভব কথা বলিতেছে)।

বিদূষক। [নানা নানারূপ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা, এবং হাস্য করিয়া সকলকে এই কথাটাই বুঝাইয়া দিলেন যে রাজকুমারীর এইরূপ একটা কথা—পাগলামো ছাড়া আর কিছুই নয়।]

রাজকুমার জয়ন্ত। (গম্ভীরভাবে) এ অসম্ভব!

রাজকুমার বিজয়। এ-রকম কথা কি কেউ কোন দিন শুনেছে?

[হাস্যজনকভাবে মুখভঙ্গী করিলেন। সভার সকলে জোরে হাসিতে লাগিলেন! রাজা তাহাদের থামাইয়া দিলেন।]

রাজকুমার সুবন্ধু। স্নেহ ও ভালবাসার কাছে কিই বা অসম্ভব আছে? (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।)

রাজা। শোন রাজকুমারগণ, আমার কন্যার অভিপ্রায় পূর্ণ করতে হবে তোমাদের। যদি দুই দিনের মধ্যে তোমাদের কেউ সোণার কমলের মালা গেঁথে আনতে পার, তবে আমার কন্যা

তার গলায় বরমাল্য দিবে—নতুবা, আমি আবার স্বয়ংবরের ব্যবস্থা করবো!

[নকীবেরা বাঁশী বাজাইয়া ঘোষণা করিল—সভা ভঙ্গের কথা। প্রথম রাজা ও রাজকুমারী, তারপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও মহিলাগণ, পরে কাশ্মীর ও কলিঙ্গের যুবরাজ। এই রাজকুমার দুইজন অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা—রাজকুমারীর অসম্ভব পণের কথা লইয়াই আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। নকীবেরা—সিংহাসনের একদিকে বিদূষক এবং রাজকুমার সুবন্ধু, অন্যদিকে কিছুক্ষণ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া বাঁ-দিক্ দিয়া এক সঙ্গে চলিয়া গেলেন। সকলে চলিয়া গেলে—রাজকুমারী কল্যাণীর সঙ্গীনিগণের গানের সুর ও নৃত্যের ধ্বনি ভাসিয়া আসিতে লাগিল।—

কোন্ বনে সে কোন্ বনে,
কোন্ সায়রের কালো জলে
সোণার কমল ফোটেরে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

[নিবিড় বন। একটা গাছ মাটিতে পড়িয়া আছে। রাজকুমার সুবন্ধু ও রাজার বিদূষক সেই গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়াছিলেন। বেলা হইয়াছে, চারিদিক উজ্জ্বল সূর্য্য-কিরণে হাসিতেছে।]

রাজকুমার সুবন্ধু। লাল, নীল, সবুজ, হল্দে, সাদা কত ফুলই দেখ্ছি! কিন্তু এই নিবিড় বনের ভিতর যে সাগর-দীঘি, যার কালো জলে—ঢেউগুলি নেচে বেড়াচ্ছে, কই তার বুকেও ত সোণার কমল ফুটতে দেখলাম না!

বিদূষক। (বিদূষকের পোষাক ছিল—লাল আর হল্দে কাপড়ের) আমি অনেকটা সোণালি বটে!

সুবন্ধু। তোমাকে ত ভাই, কেউ ফুল বলবে না! (বনের দিকে লক্ষ্য করিয়া)—অই দেখ গাছের আড়াল দিয়ে, কে এগিয়ে আসছেন?

বিদূষক। কে আর আসবে? বোধহয় কোন গরীব ভিখারী হবে।

সুবন্ধু। আমার কাছে যে ভাই, আর কিছুই নাই! শুধু একটি মাত্র স্বর্ণমুদ্রা আছে! (গায়ের জামাতে হাত দিলেন)।

[বনের ভিতর হইতে একজন লোক প্রবেশ করিল। তাহার সারা দেহ কালো বসনে আবৃত মুখ ঢাকা, তার চোখ দুইটি শুধু দেখা যাইতেছে। সে লাঠি ভর করিয়া আস্তে আস্তে রাজকুমার সুবন্ধু ও বিদূষকের কাছে আসিল]

ভিখারী। আমাকে একটা পয়সা দেবে বাবা? গরীব ভিখারী, বুড়ো মানুষ,—উঃ বড় কষ্ট!

বিদূষক। রাজকুমার, সাবধান, ঐ মোহরটি যেন এই বুড়োটাকে দিওনা। এটি আমাদের শেষ-সম্বল!

রাজকুমার সুবন্ধু। কি বল, বুড়ো ভিখারী মানুষ, আর আমরা তরুণ যুবক। একে দিব না?

[রাজকুমার নবাগত ভিখারীকে মোহরটি দান করিলেন।]

ভিখারী। [মোহরটি হাতে লইয়াই সে কালো আলখাল্লাটি শরীর হইতে সরাইয়া ফেলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। দেখা গেল, তার মুখে লম্বা সাদা দাড়ি, বুক পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মাথায় পাকা লম্বা চুল, দীর্ঘ নাসিকা, আর অদ্ভুত ধরণের ত্রিকোণাকার টুপি।]

রাজকুমার সুবন্ধু। [পিছনে হটিলেন] কে, কে তুমি?

ভিখারী। আমি? আমাকে জান না? আমি সেই বিখ্যাত যাদুকর রামরাজা!

বিদূষক। [গাছের আড়ালে লুকাইতে চেষ্টা করিল। রাজকুমার সুবন্ধুও একটু বিচলিত হইলেন।]

সুবন্ধু।—আপনি? আশ্চর্য্যত!

রামরাজা। হাঁ, আমি রামরাজা। ভয় পেয়োনা রাজকুমার। আমি জানি, কেন, কি উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি এই গভীর বনে প্রবেশ

করেছ। তুমি চাও সোণার কমল! [হো—হো, হা—হা করিয়া খানিকক্ষণ বিকট হাস্য করিলেন]

রাজকুমার ও বিদূষক। [একসঙ্গে—আজ্ঞে যা চাই।]

রামরাজা। বেশ, এই যে স্বর্ণ মুদ্রাটি তোমার শেষ সম্বল না, এই স্বর্ণমুদ্রাটি আমার যাদুবিদ্যার প্রমাণ দিবে! এইবনে যে বন-পরীরা বাস করেন, আমি এইটি তাদের দিচ্ছি! [যাদুকর রামরাজা ডানদিকে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া এক স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তারপর তাঁহার যাদুদন্ড-

যাদুকর যাদুদণ্ড দিয়া আঘাত করিলেন...দেখাদিল পরীরা

দিয়া তিনবার মাটিতে মৃদু আঘাত করিলেন। অমনি ছয়জন বনপরী পীতবর্ণের পোষাক পরিয়া এবং সারা গায়ে ফুলের সাজে সাজিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথম পরী, রামরাজার নিকটে গিয়া নতজানু হইয়া তাহার হস্ত চুম্বন করিল। রামরাজা তাহার হাতে স্বর্ণমুদ্রাটি দিলেন। সে মুদ্রাটিকে খানিকক্ষণ পরীক্ষা করিল, তারপর তাড়াতাড়ি বাম দিকে চলিয়া গেল। যাইবার সময় ও সে নৃত্য-ভঙ্গীতে

চলিয়া গেল। সেখানে যাইয়া মুদ্রাটি মাথার উপর তুলিয়া ধরিল। নৃত্যগীত হইতে লাগিল।]

বনে বনে বন-মঞ্জীরে
কি গীত উঠিছে ঘন বাজিরে!
অই আম্রমঞ্জরী দোলে
অই গুঞ্জরি ভ্রমর বোলে,
হের নদী বুকে ঢেউ, উঠে আর পড়ে ধীর সমীরে!
বনে পলাশ—কুসুম হাসে,
শোন কোকিলের কল ভাষে!
পাখী উড়ে চলে মধু গীত গাহিরে।

[নৃত্যগীত শেষ হইলে পর সকল পরীরা আসিয়া প্রথম পরীকে—(সে অন্যান্য পরীদের হইতে একটু দীর্ঘকায়); ঘিরিয়া দাঁড়াইল। প্রথম পরী সকলকে স্বর্ণমুদ্রাটি দেখাইল।]

সকল পরী। (আশ্চর্য্য হইয়া) এ ভাই খাদুবিদো! সত্যি কি স্বর্ণমুদ্রা?

প্রথম পরী। এই স্বর্ণমুদ্রারই সাহায্যে আমরা শত শত সোণার কমল ফুটিয়ে তুলব।

সকলে। বল কি ভাই? বল কি? সোণার কমল! সোণার কমল!

প্রথম পরী। হ্যাঁ, ভাই।

সকলে। সোণার কমল! সোণার কমল! বল কিগো! বল কি?

প্রথম পরী। হাঁ গো, হাঁ। এস ফুল ফুটিয়ে তুলি।

ফুটেছে সোণার কমল
দূরে অই কমল বনে,
ঝরেছে সোণার তারা
ছিল সে-যে নীল গগনে।
বেদনা-জড়িত ধরার বুকে,
দুঃখের গানে গভীর শোকে
ফুটায় যারা মুখের হাসি
তারা হাসে এ কমল বনে।

[পরীরা সকলে মৃদুপদক্ষেপে নাচিতে নাচিতে এক পাশ দিয়া চলিয়া গেল]

সুবন্ধু। এরা সব কোথায় গেল?

রামরাজা। পরীরা চলে যাচ্ছে, সেই দূরে বনে, যেখানে দেবদারু কুঞ্জের ছায়াতলে শ্যামলী-লতার গায়ে অজস্র সুরভি ফুলে ফুটে আছে। যেখানে মধুপেরা গুঞ্জনে—গানে বনকে প্রমোদিত করে তুলেছে! যেখানে সবুজ ঘাসে রঙ্গীন ফুলে শোভা বিস্তার করছে। যেখানে চুপে চুপে বাতাস বয়ে যায়—যেখানে কুঞ্জের ছায়ায় ছায়ায় ঝরণা ঝির্ ঝির্ করে হীরা গলিয়ে নেচে যায়, সেইখানে পরীরা সব চলে যাচ্ছে—

বিদূষক। (অদ্ভুত ভঙ্গী প্রকাশে) সেখানে তারা কি করবে? কেন তারা চলে গেল? কি সুন্দর সব। যেন একটা কল্পনার রঙ্গীন স্বপ্ন দেখছিলুম...

রামরাজা। বলছি শোন। (রাজকুমার সুবন্ধুকে এবং বিদূষককে দুই দিক দিয়া বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রঙ্গমঞ্চের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল।—) শোন বলি, কেন তারা চলে গেল। যখন কোন রাজকুমার, যখন কোন মহৎব্যক্তি, কোন দীন দরিদ্রের, বিপন্নের, অন্নহীনের উপকারের জন্য আপনার যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করে, তখন হয় একজন পরীর জন্ম। —রাজকুমার সুবন্ধু যেমনি এক বৃদ্ধভিখারীকে তার শেষ সম্বল একটিমাত্র স্বর্ণ-মুদ্রা দান করলেন,—তখনই সেই মুহূর্ত্তেই দূরে নীলপাহাড়ের আড়ালে দেবদারুকুঞ্জে, দক্ষিণ পবনের মধুর স্পর্শে বসন্তের শোভা ফুটে উঠেছিল। পাখীরা মধুর স্বরে গান গেয়েছিল, আর সেই সময়ে—নির্ঝরের তীরে জন্মলাভ করেছে সেই নবীন পরী। এই বনের সেই নিভৃত প্রদেশে—সেপরী ঘুমিয়ে আছে।

রাজকুমার সুবন্ধু। নূতন পরী! নূতন পরী!

রামরাজা। সে পরী—কমলবনের কমল পরী। তাইত, সোণার কমল ফুটাবার জন্য বনের এই পরীরা সব ব্যগ্র হয়েছিল। এই নূতন পরী হবে সোণার কমলের অধিকারিণী। [যাদুকর একবার রঙ্গভূমির দক্ষিণ দিকে খানিকটা অগ্রসর

হইয়া; অই দেখ! আমার পরীরা কমল-বিলাসী সেই পরীকে পেয়েছে, এই যে—এই যে তারা আসছে!

[পরীর দল সঙ্গীত ও নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ করিল। মধ্যে কমলবনের কমল-পরী। হাতে তার সোণার কমল। কন্ঠে তাহার কমলমালা, মাথায় তাহার কমল-মুকুট। এলায়িত কেশে ও কমলের মালা, রাজকুমার, যাদুকর এবং বিদূষকের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কমল-পরী রাজা সুবন্ধুর কাছে গিয়া সোণার কমলের এক বৃহৎ স্তবক উপহার দিলেন। অন্যান্য পরীরা সকলে বৃত্তাকারে তাহাদিগকে ঘিরিয়া সঙ্গীত ও নৃত্য করিতে লাগিল।]

দেখ অই ঘুমের ঘোরে স্বপন ছবি
সে আননে আছে জেগে,
সোণার মুকুট শিরে পরি
সোণার রবির অরুণরাগে।
অই দেবদারু কুঞ্জ তলে
নির্ঝর যেথায় হাসে খেলে
সেথায় ছিল ঘুমের ঘোরে,
জেগেছে সে পাখীর ডাকে।
এখন চাইবে যখন নয়ন মেলে
ফুটবে কমল দলে দলে
সোণার ঢেউয়ে ভরবে ভুবন
বাজবে বাঁশী নবীন রাগে।

মরাজা। রাজপুত্র, এই নাও তোমার সোণার কমল! এই নাও তোমার কমলমালা।

রাজকুমার। কি সুন্দর! এই কমল-মালা! সোণালি প্রভায় চারিদিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কি দীপ্তি! কি শোভা! আমি যখন রাজকন্যাকে লাভ করব, তখন আবার উদ্যানে ফুটবে সহস্র সহস্র সোণার কমল।

বিদূষক। আগে, রাজকুমারীকে পেয়ে নাও! তারপরে বরং......

রাজকুমার সুবন্ধু। ঠিক্ কথা বন্ধু! শোন পরীগণ, শোন মহাপ্রাণ মায়াবী যাদুকর, তোমরা আমার শত শত ধন্যবাদ গ্রহণ কর। শুধু একটি অনুরোধ আমার—কোশলের নৃপতির

রাজসভায় তোমাদের উপস্থিত হতে হবে! আমার বিবাহের উৎসব দিনে সঙ্গীতে ও নৃত্যে তোমাদের সেই ভবনকে উৎফুল্ল করে তুলতে হবে। —যাবে তোমরা? রাখবে আমার এই অনুরোধ?

সকলে। হাঁগো হাঁ! হাঁগো হাঁ! হাঁগো হাঁ! যাব, যাব, যাব!

রাজা সুবন্ধু। এস সকলে, আর ত সময় নেই। [রাজকুমার কমল-পরীর হাতখানি ধরিয়া অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহার পশ্চাতে চলিল—যাদুকর, বিদূষক ও সমুদয় পরীগণ]

তৃতীয় অঙ্ক

[রাজা কর্ণদেবের রাজসভা। রাজা ও রাজকুমারী, সভাসদগণ প্রবেশ করিলেন এবং সিংহাসনে বসিলেন। দুইজন ঘোষণাকারী প্রবেশ করিল এবং রঙ্গভূমির দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল]

রাজা। আর ত সময় নেই, অর্দ্ধ দণ্ড মাত্র বাকী। আর রাজকুমারেরা দেখছি, বড়ই বিলম্ব করে ফেলছেন। আমাদের সময়—

রাজকুমারী কল্যাণী। কাজটি ও ত বাবা গুরুতর।

রাজা। তা বটে। এখনও একজন আসছে না, কোথায় গেল তারা!

প্রথম সভা। বোধহয় বেঁচে নেই।

দ্বিতীয় সভা। বোধহয় পথ হারিয়েছে।

তৃতীয় সভা। বোধহয় কেউ যাদু করেছে।

চতুর্থ সভা। বোধহয় জলে ডুবেছে।

প্রথম মহিলা। ঠিক বাঘে খেয়েছে।

দ্বিতীয় মহিলা। নিশ্চয় ভালুকের হাতে পড়েছে।

তৃতীয় মহিলা। সিংহের হাতে পড়াওত বিচিত্র নয়।

চতুর্থ মহিলা। বাঘের ভয়ও ত আছে।

রাজকুমারী। (সহসা বেগে সিংহাসন হইতে উঠিয়া) থাম তোমরা সব, কিসব কথা বলছ তোমরা!

[নকীব বাঁশী বাজাইল]

রাজা। কে এল ?

(রাজকুমার জয়ন্ত। হাতে একটি পীতাভ ফুল লইয়া প্রবেশ করিল)।

রাজা। এস, জয়ন্ত!

জয়ন্ত। আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন মহারাজ, এই নিন সোণার কমল। (ফুলটি রাজার হাতে দিলেন)।

রাজা। ফুলটির রং আমার কাছে গোলাপি বলে মনে হচ্ছে। তোমার কি মনে হয় কল্যাণী? (রাজা, রাজকুমারীর হাতে ফুলটি তুলিয়া দিলেন।)

রাজকুমারী। না—এত সে ফুল নয়! সে হবে সোণার কমল। রাজকুমার এই নিন্ আপনার ফুল! (ফুলটি জয়ন্তকে ফিরাইয়া দিলেন।) জয়ন্ত বিমর্ষ চিত্তে বিরক্তির সহিত ফুলটি ফিরাইয়া লইল এবং মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নকীব পুনরায় বাঁশী বাজাইল। এইবার বিজয়সিংহ আসিলেন। তার হাতে একটি রজনীগন্ধার স্তবক।

রাজা। এস, এস যুবরাজ।

বিজয়। প্রণাম, মহারাজ! (রাজার হাতে ফুল দিলেন) আমি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হয়েছি।

রাজা। এত সোণার কমল নয়। এ যে শ্বেত-পুষ্প-স্তবক (রাজকুমারীকে স্তবকটি দিলেন।)

বিজয়। (শঙ্কিতভাবে) সন্ধ্যার প্রদীপ-রশ্মিতে এর বর্ণ হয়ে যায় অপরূপ হেমাভ।

রাজকুমারী। না—না—[illegible] হবে এই ফুল? আমার সেই প্রার্থিত স্বর্ণকমল ত নয়! এই নিন্ আপনার এই শুভ্র রজনীগন্ধার স্তবক। (রাজকুমারকে ফুল ফিরাইয়া দিলেন।)

[নকীব বাঁশী ফুকারিল]

রাজকুমারী। এই যে তিনি আস্ছেন।

সুবন্ধু। (প্রবেশ করিয়া) দেবী কল্যাণী, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। প্রণাম মহারাজাধিরাজ। আমি আপনার কন্যার পাণি প্রার্থনা করি মহারাজ। (হাতে ছিল তার সোণার কমল)।

(রাজসভার মধ্যে চঞ্চলতা দেখা গেল)

রাজা। কি? কি বলছো তুমি?

রাজকুমারী। (হাততালি দিয়া) চমৎকার! চমৎকার!

মহারাজ...সোণার কমল নিয়ে এসেছি রাজকুমারীর জন্য

সুবন্ধু। শুনুন মহারাজ, শুনুন আপনারা, আমি রাজকুমারীর জন্য সোণার কমল নিয়ে এসেছি।

রাজকুমারী। কোথায় পেলেন এ বিচিত্র ফুল। (আশ্চর্য্য হইলেন এবং বিস্মিত হয়ে পরস্পরের প্রতি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া) সোণার-কমল! সোণার-কমল!

রাজা। কোথায়? কোথায় (উৎসুক ভাব দেখাইলেন)।

সুবন্ধু। আমার বন্ধু বনের পরীরা সব আর যাদুকর রামরাজা বাইরে অপেক্ষা কচ্চেন। তাদের সঙ্গে সোণার কমল-মালা রয়েছে।

[নকীব বাঁশী বাজাইল। রামরাজা ও কমলপরী আসিলেন। অন্যান্য পরীরা সকলে নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে আসিলেন। কমল-পরী সোণার কমল-মালা রাজকন্যার হাতে দিলেন। বিদূষক প্রবেশ করিয়া চুপি চুপি রাজসিংহাসনের পিছনে লুকাইল।]

রাজকন্যা। (আনন্দের সহিত) কি সুন্দর এই ফুল! কি চমৎকার দেখতে, চারিদিকে সোণার আলোকের ঝরণা ধারা ঝরে পড়ছে। অপরূপ এই কমল-মালা স্বর্গের সুষমা ও সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছে! (রাজকন্যা, রাজকুমার সুবন্ধুর দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। রাজকুমার হস্ত চুম্বন করিলেন।) আমি জানতাম তুমি এই সোণার কমল নিয়ে আসবে।

রাজা (একটী ফুল লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন) অপূর্ব্ব এই ফুল। সত্যি কি এই ফুল ফোটে?

সুবন্ধু। একটি দুইটি নয় হাজারে হাজারে ফোটে।

যাদুকর। হাঁ, মহারাজ সেই মায়াবন এই সোণার কমলে পূর্ণ।

রাজা। (উঠিয়া—সকলের দিকে চাহিয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া) চলুন, সকলে আমরা কমলবনে বেড়াতে যাই, সেই নিবিড় গহনে!

[রাজা সিংহাসন হইতে নামিলেন। কমলপরী তাঁহার হাত ধরিল। যাদুকর, বনপরী, সভাসদগণ সকলে চলিলেন, সকলের শেষে

মাথা নীচু করিয়া বিষণ্ণভাবে চলিল-জয়ন্ত ও বিজয়। শুধু রাজকুমারী এবং সুবন্ধু রহিলেন।]

রাজকুমারী। (মালার দিকে চাহিয়া এবং ফুল লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিলেন) সে বনে কি নিত্য এমনি করে সোণার কমল ফোটে?

সুবন্ধু। হাঁ, কল্যাণী, ফোটে। জান, পরীরা বলেছেন আমাদের বিবাহের পর, যখন রাজা ও রাণী হব, আমাদের প্রত্যেকটি মহৎ কাজ সোণার কমল হয়ে ফুটে উঠবে ঐ গভীর বনে।

কল্যানী। আমরা কেবলি ভাল কাজ করব। দুঃখীর দুঃখ দূর করবো, ব্যথিতের অশ্রু মোছাবো...অন্নহীনকে অন্ন দিব। আমাদের ভাল কাজ হাজার হাজার কমল হয়ে ফুটে রইবে সে কমলবনে।

সুবন্ধু। সকল কাজের ফলে নির্ম্মল, সুন্দর সুরভিতে সোণার কমল হবে। (রাজকুমার ও রাজকুমারী দুইজনে মাঝখানে দাঁড়াইলেন)।

বিদূষক। আর কি! আমার কথাটি ফুরুলো নটে গাছটি মুরুলো! এখন খুব আনন্দে, হাসি ও খেলায় দিন কাটবে! [রাজা, সভাসদগণ প্রভৃতি সকলে পরীগণের সহিত আসিলেন। সুবন্ধুও কল্যাণীর মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে তাহারা গাহিতে ও নাচিতে লাগিল।]

আমরা ধরার বেদনা ঘুচাতে আসি,
আমরা জানিনা যাতনা—হাসি ভালবাসি!
আমরা রবির কিরণে খেলি,
আমরা গিরি-শিরে-শিরে নেচে চলি।
ঢালি করুণার ধারা—সুধার রাশি।
আমরা জানি ফুটাতে হাসি, মধুর বদনে হাসি।
আমরা করুণার সহচরী
ঝর্ ঝর্ ঢালি করুণা-বারি
পরশে ফুটাই সোণার কমল
ব্যথিত বদনে হাসি।
আমরা আনন্দেরি কিরণ-ধারা
চাঁদের জ্যোছনারাশি!

[বাইরে গীতধ্বনি শোনা গেল—ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল]